বাংলা কথা-সাহিত্যে তেভাগা কৃষক-সংগ্রাম

সুস্নাত দাশ

অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৬-৪৭ এবং উভয় বাংলায় উত্তর-উপনিবেশকালে (১৯৪৮-৪৯) গড়ে ওঠা লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ জনতার অংশগ্রহণে পরিচালিত তেভাগা-কৃষক সংগ্রাম এক ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলন রূপে আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থান পেয়েছে। উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুই ভাগের দাবিতে সংগঠিত বাংলার প্রায় ষাট লক্ষ ভাগচাষী-বর্গাদারদের দুটি পর্যায়ে চলা এই আন্দোলন-সংগ্রাম ছিল এমনই একটি জ্বলন্ত বিষয় যার সঙ্গে জনগণের বেঁচে থাকা ও জীবনধারণের প্রশ্নটি ছিল সম্পৃক্ত। তাই এই কৃষক-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে রচিত শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-নাটক ও অন্যবিধ সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম আজও শাশ্বত হয়ে আছে। তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস চর্চায় এই উপাদানগুলি আজও সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছে তেমন গুরুত্ব লাভ করে নি বলেই বোধ হয়। এই নিবন্ধে বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধতম কথাসাহিত্যে, যথা-ছোট-গল্প, উপন্যাস, সংবাদ-প্রতিবেদন বা অন্যবিধ গদ্য-রচনায় তেভাগা-কৃষক সংগ্রাম কিভাবে ও কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে; এই মহতী আন্দোলনের কার্য-কারণ ও প্রেক্ষিতে এ-জাতীয় কথা-সাহিত্যের দর্পণে কোন্ সত্যের উদ্‌ঘাটন করেছে, তার অনুপুঙ্খ আলোচনা করার প্রয়াস এই গবেষণা নিবন্ধে করা হবে।

প্রায় ষাট বছর পূর্বে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত পরাধীন ভারতবর্ষের বঙ্গদেশের গ্রামে-গঞ্জে তেভাগা কৃষক সংগ্রাম বা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার ডাকা কমবেশি উনিশটি জেলায় প্রায় ষাট লক্ষ মানুষের এই লড়াইটি ছিল কৃষক, ভাগচাষি ও কৃষি-শ্রমিকের আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস ও স্বাধিকারের সংগ্রাম। আন্দোলনের এক পক্ষে প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সরকার, প্রবলশক্তিধর জমিদার ও প্রভাবশালী জোতদার-মহাজনের দল আর অপর পক্ষে সাধারণ চাষি, নিপীড়িত খেত-মজুর ও প্রবঞ্চিত বর্গাদার। ফসলের ভাগ কতটা পাওয়ার অধিকার কার—তা নিয়ে স্বাধীনতার আগে ও পরে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রামের পর শেষ পর্যন্ত এ-লড়াইতে বিজয়ী হয়েছিল দ্বিতীয় পক্ষের গরিব-ভাগচাষি ও কৃষি-শ্রমিকগণ।

বলাবাহুল্য ঐতিহাসিক এই ঘটনাপুঞ্জকে অবলম্বন করে সেকালের সাহিত্যিক-শিল্পী-সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বস্তুনিষ্ঠ ছোটগল্প, রিপোর্টাজ, উপন্যাস ও স্মৃতিচারণগুলি তাৎপর্যময় এবং নানা কারণে দেশবাসীর কাছে আজও গুরুত্বপূর্ণ ও

দাশ, সুস্নাত : বাংলা কথা-সাহিত্যে তেভাগা কৃষক-সংগ্রাম
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 100-125

প্রাসঙ্গিক। এর প্রথম কারণ তেভাগার আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। হিন্দু-মুসলমান-সাঁওতাল অবিভক্ত (ঔপনিবেশিক বাংলার) সকল ধর্মের কৃষি-উৎপাদক ও খেত-মজুর এতে সমবেতভাবে যুক্ত ছিল; যোগদানকারীদের মধ্যে জাতি-শ্রেণি-বর্ণের বিভেদ ছিল না। দ্বিতীয় কারণ তেভাগার আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। কৃষিজীবীদের ঘরের মেয়ে-বৌরা এই সংগ্রামে বিরাট সহযোগী ছিলেন; অনেক ক্ষেত্রে প্রধান শক্তি। তাঁরা লেখাপড়া জানতেন না, দুবেলা খাবার জুটত না, কতশত ধর্মীয় সংস্কার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন, কিন্তু এ-সবের ঊর্ধ্বে উঠে তখন তাঁরা যে সাহস সচেতনতা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন তা অসাধারণ ও বিস্ময়কর! নির্যাতিত নারীগণ নিজেদের মান দিয়েছিলেন-প্রাণ দিয়েছিলেন দু-ধরনের মুক্তির জন্যে। শ্রেণীশোষণ ও সামাজিক শোষণ থেকে স্থায়ী নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে। তেভাগা আন্দোলনের তাৎপর্য এক্ষেত্রে ব্যাপক।

অবিভক্ত বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে একটি 'মার্কসবাদী রেনেসাঁন্স' ঘটেছিল একথা মনস্বী গোপাল হালদার সহ আরো কোনো কোনো বিদ্বান মনে করেন। সত্যসত্যই বাংলার এই 'দ্বিতীয় নবজাগরণ' ঘটেছিল কিনা—সেই বিতর্কের নিষ্পত্তি এখনো না হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক চৈতন্য মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষার দ্বারা যথেষ্ট আলোড়িত হয়েছিল। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে—স্বাধীনতা লাভের আগে ও পরে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই পাঁচটি বছর বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন অনেক গণ-আন্দোলন ও সংগ্রামের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বাংলার সংস্কৃতিতে প্রায় সকল ধারায় যা স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছে। দুটি পর্যায়ে তেভাগা কৃষক সংগ্রাম (১৯৪৬-৫০) যার মধ্যে প্রধানতম। এই কৃষক অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে রচিত শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-নাটক ও অন্যবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আজও শাশ্বত হয়ে রয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য—তা হল, সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি, অর্থাৎ সাহিত্য-শিল্প এবং অন্যান্য সৃজনশীল শিল্পকলা (নৃত্য-নাটক-ব্যালে ইত্যাদি) আন্দোলন-সংগ্রাম চলাকালেই যে রচিত হয়েছিল বা আন্দোলন সংগঠনে বিশেষ কোনো ভূমিকা পালন করেছিল—এমন কথা বলা যায় না, বরঞ্চ তেভাগা আন্দোলন নিয়ে এমন কিছু গল্প-উপন্যাস-গান-নাটক-কবিতা ইত্যাদি রচিত হয়েছিল যা উনিশশো পঞ্চাশের দশকের সূচনায় বা তেভাগা-আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহৃত হবার পরেই রচনা করা হয়। অবশ্য তার জন্য ওই শিল্পকর্ম সমূহের আবেদন ও তাৎপর্য কিছুমাত্র খণ্ডিত হয়েছিল—এমনটা বলা যায় না। বস্তুত ইতিহাসে এর এমন উদাহরণ অনেক রয়েছে—যেমন আধুনিক বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনজাগরণ ফরাসি বিপ্লব চলাকালীন (১৭৮৯-৯৯) তেমন কোনো বিপ্লবী সাহিত্য রচিত না হলেও পরবর্তীকালে বিপ্লবী আন্দোলন থিতিয়ে যাবার পরই উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিগুলি ঘটে বলে ফরাসি ঐতিহাসিক মিশেল কারিয়ের মন্তব্য করেছেন।

এই প্রসঙ্গে চলে আসে বাংলার ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের (১৯৪০-৪৫) কথা। উক্ত আন্দোলনের সংগঠকেরা ছিলেন প্রধানত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ।

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে মোহ তুলনামূলক বিচারে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই ছিল সর্বাধিক। তাই সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী উপাদান ওই আন্দোলন চলাকালীনই বেশি কাজে এসেছিল—প্রচারক ও সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু তেভাগা আন্দোলন নিয়ে রচিত বাংলা-সাহিত্য ও শিল্প নিরক্ষর, স্বল্প লেখাপড়া জানা কৃষকসমাজকে কতটা সংগঠিত করতে বা তাদের সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছিল সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। এই নিবন্ধে বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হবে। তবে এই প্রসঙ্গে যে-কথাটি সত্য তা হল তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে কলকাতা-সহ শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত মানুষজনের (বিশেষত ভূমিস্বত্বভোগী নাগরিকদের) বিরূপ মনোভাব। বাংলার গ্রামাঞ্চলের এই তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা এই বিরূপ মানসিকতা কাটাতে তেভাগা-প্রভাবিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের অবদান কোনোমতেই অস্বীকার করা বোধহয় চলে না।

তেভাগা-আন্দোলনের সমসাময়িক কালেই রচিত হোক, কিংবা পরেই হোক—বাংলা সাহিত্য-শিল্প-সাংবাদিকতা-সংগীত-নাটক—এমনকি সামাজিক আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যে গ্রামবাংলার ৬০ লক্ষ ভাগচাষির এই ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রাম (যাকে অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ গণ-আন্দোলনরূপে চিহ্নিত করে থাকেন) বলাবাহুল্য গভীর ছাপ রেখে গেছে—যা একমাত্র নীলবিদ্রোহের রূপকার নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নির্মাণের সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে। তেভাগা কৃষক সংগ্রামের প্রভাবে রচিত ও সৃষ্ট সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতাকে পৃথক পৃথক পর্যায়ে ভাগ করা চলে। তেভাগা আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংগীতের যে ভূমিকা ছিল কবিতার তা নয়, আবার কথাসাহিত্য সৃষ্টিতে ছোটগল্পের যে সার্থকতা, উপন্যাস বা নাটক রচনার ক্ষেত্রে তা ততটা পরিলক্ষিত হয়নি। তেভাগা আন্দোলনের বিষয়-কেন্দ্রিক নৃত্যকলা, ব্যালে বা নাট্যাভিনয়ের সরব উপস্থিতি সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা চিত্রকলা বা সংবাদ প্রতিবেদন (রিপোর্টাজ)-এর ভূমিকা কোনোভাবেই উপেক্ষণীয় ছিল না। এসব দিক বিচার করলে বোঝা যায় বাংলা-সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় তেভাগা কৃষক সংগ্রামের প্রতিফলন কতটা ও কীরকম পড়েছিল।

বাংলা কথাসাহিত্যের সবথেকে সমৃদ্ধ ধারা ছোটগল্পের মাধ্যমে গ্রাম জীবনের ছবি আঁকার কাজ আধুনিককালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অনেক লেখকই করেছেন। প্রসঙ্গত, তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কিন্তু কৃষক জাগরণ, আন্দোলন ও সংগ্রাম সেখানে কোথায়? জমিদারি প্রথা সম্পর্কে তারাশঙ্করের মনে সমর্থনকারী মোহ না থাকলেও তা উচ্ছেদের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত তাঁর রচনার কোথাও কি আছে? প্রধানত গান্ধী-আদর্শে অনুপ্রাণিত গ্রামসেবা, গ্রামস্বরাজ, এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক চেতনাই তাঁর অনন্য গল্প-উপন্যাসগুলিতে পরিব্যাপ্ত। বাংলা ছোটগল্পে শ্রেণীসচেতন কৃষক-সংগ্রামের প্রতিফলন সর্বপ্রথম ঘটে তেভাগা আন্দোলন-কেন্দ্রিক রচনাগুলিতেই। নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর সময়কালের মধ্যে পুরোধা ব্যক্তিত্ব। মানিকবাবু ছাড়া উনিশশো চল্লিশের দশকে শেষ ও উনিশশো পঞ্চাশের

দশকের প্রথম ভাগে যাঁরা তেভাগা কৃষক সংগ্রামকে ছোটগল্পে ভাষা দিয়েছিলেন সেই মার্কসবাদে দীক্ষিত, প্রায় অখ্যাত নবীন লেখকদের সকলেই আজ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রূপকার রূপেই সুপরিচিত। তৎকালে কিছুটা খ্যাতি ছিল সাহিত্যিক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা, সমরেশ বসু, সৌরী ঘটক, মিহির আচার্য, মিহির সেন, আবু ইসহাক্ প্রমুখ। এঁদের রচিত অন্তত কুড়িটি গল্প বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের মাধ্যমে তেভাগা আন্দোলনের ধারাকে বহন করে চলেছে।

তেভাগা কৃষক সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী কৃষক-জনতার জীবনযাপন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নানা প্রসঙ্গ, যা ওই আন্দোলনেরই দান—গল্পগুলিতে নানা মাত্রায় ও ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়েছে। এই গল্পগুলিতে যে-বিষয়গুলি রূপায়িত হয়েছে তেভাগা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নানা পর্যায় ভেদে সেগুলি হল—

১। ভাগচাষি, বর্গাদার এমনকী ভূমিহীন চাষিদের আত্মসচেতনতা পারস্পরিক শ্রেণীমৈত্রী।

২। কৃষক সমাজের আত্মপ্রত্যয়, লড়াকু মানসিকতা, প্রতিরোধ-স্পৃহা।

৩। সামন্ততান্ত্রিক পারিবারিক অনুশাসন, রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান।

৪। কৃষক রমণীদের তেভাগা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আত্মবলিদান।

৫। তেভাগার লড়াই চলাকালীন রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাসের ফলে থমথমে ও আতঙ্কিত পরিবেশ।

৬। সাঁওতাল প্রমুখ আদিবাসী ও উপজাতিদের আন্দোলনে যোগদান।

৭। হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতি।

আলোচ্য তেভাগা অনুপ্রাণিত কোনো কোনো গল্পের মধ্যে উপযুক্ত একাধিক প্রসঙ্গ একত্রে উত্থাপিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি হল স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের **'মন্ত্রশক্তি'** এবং মিহির আচার্যের **'দালাল'**। তেভাগা কৃষক সংগ্রাম যে নিছক ভাগচাষি আন্দোলনই ছিল না—মিত্রশক্তিরূপে ভূমিহীন চাষি এ নিম্নবর্গের জনতাকেও যে তা আত্মসচেতনতা ও বিশ্বাসে বলীয়ান করে তুলেছিল—তার প্রকাশ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের গল্পটিতে। গল্পটি এরকম গাঁয়ের সিঁধেল চোর রসুল চুরি করতে বেরোয় প্রতিরাতে। তার বিবি আমিনা পড়ে দেয় বিপদনাশক মন্ত্র। কৃষক সমিতি-টমিতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকে রসুল। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের চৌকিদার (জোতদারের গুপ্তচরও বটে) যখন খবর জোগাড় করতে আসে রসুলের কাছে—তখন কথাবার্তা এরকমই হয়—রসুল, তোদের পাড়ায় আজকাল নাকি তেভাগার মিটিং হয়? বাইরে থেকে স্বদেশী বাবুরা নাকি মাঝে মাঝে আসে। মুন্সিবাড়ি রাত কাটায়?

ঘরের মধ্যে থেকে রসুল জবাব দেয়—তাই তো শুনি।

—তুই যাস না?

—না চাচা।

—ক্যান।

—উসব ভজঘটের মধ্যে গিয়ে ফয়দা কী? রসুল হুঁকো নিয়ে বাইরে আসে।

—কী লাভ কও। উয়াগরে বুলি, 'লাঙ্গল যার, জমি তার।' আমার জমিও নাই, লাঙ্গলও নাই।

শেষ পর্যন্ত সেই ভূমিহীন চাষি সিঁধেল চোর রসুল কাঁসারিপাড়ায় ধানচুরি করতে বেরিয়ে (ভূমিহীন হলেও রসুলের শ্রেণীচেতনার আর এক প্রকাশ দরিদ্র চাষি পাড়ায় সে কদাচ চুরি করতে যায় না।) আবার ঘরে ফিরে আসে তার একমাত্র অস্ত্র পাকানো লাঠিটি নিতে। কুতুবপুরের পাঁচ আনির জমিদারের লেঠেলের সঙ্গে লড়ে ফসলের দুইভাগ ছিনিয়ে আনার জন্য তৈরি হচ্ছে যে কৃষক বাহিনী তাতে সে সামিল হয়। সমাজের নিম্নবর্গের একজন রসুল এইভাবেই হয়ে ওঠে শ্রেণীসচেতন, পরিণত হয় একজন তেভাগা-সৈনিকে।

গল্পটির শেষ এখানেই নয়। সে প্রতিরাত্রে চুরি করতে বেরোবার সময় বিবি আমিনা সর্বদা পড়ে দিত রক্ষাকবচের মন্ত্র (মুসলমান হলেও মানত হিন্দুরই মন্ত্র—লোকাচারে নিম্নবর্গে কোনো সাম্প্রদায়িকতা ছিল না)—কিন্তু তেভাগা আদায়ের লড়াইয়ে যাওয়া রসুলের কাছে এইবার সেই মন্ত্র পড়তে যেতেই একদা সিঁধেল চোর রসুলের বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া অবশ্য প্রণিধানযোগ্য 'রাখ মাগি তোর মন্তর। বলেই রসুল একলাফে দাওয়া ছেড়ে উঠোনের মাঝখানে গিয়ে পড়ে। সে কি কোনো গুপ্তকর্মে যাচ্ছে যে গুপ্ত মন্ত্র শুনবে? রসুল এখন আর এক মন্ত্রের টানে দশজনের সঙ্গে বুকটান করে সারা দুনিয়ার বুকের উপর দিয়ে প্রকাশ্যেই একটা পুরুষের মতো, একটা বাপের ব্যাটার মতো কাজ করতে চলেছে—একটা কাজের মতো কাজ।'

ভাবতে অবাক লাগে কোন মন্ত্রশক্তির জোরে ভূমিহীন এক চাষি ভাগচাষিদের সংগ্রামে দৈবমন্ত্র-তন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে যুগ-যুগান্তরের কুসংস্কারের জোয়ার ছিঁড়ে ফেলে এভাবে অংশগ্রহণ করতে পারল? এটাই তেভাগার সার্থকতা।

মিহির আচার্যের **'দালাল'** গল্পে দ্বীপচাঁদ বা ঢিপা হল লাঠুয়া বা দালাল। কোনো একদিন সে-ও একজন চাষি। লড়াই-সংগ্রামের পুরোভাগেই থাকত। কিন্তু কালক্রমে সে হল দালাল। প্রথমে ব্রিটিশ রাজত্বে জমিদার-মজুতদারদের দালালি—স্বাধীন ভারতে শুরু করল জোতদার আর গ্রামীণ টাউটদের মোসাহেবি। পুলিশের চর হয়ে তার কাজ ছিল শহর থেকে গ্রামে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতে আসা কমিউনিস্ট কর্মীদের ধরিয়ে দেওয়া। দালালি কিন্তু ঢিপা লাঠুয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়—এই পেশার আত্মগ্লানি তার-ও কম কিছু নেই। কিন্তু সে নিরুপায়। কারণ, স্বাধীন দেশের পুলিশ নইলে তাকে ছাড়বে না। বাঁচার নিরুপায় তাগিদে দ্বীপচাঁদকে করতে হয় লাঠুয়াগিরি (দালালি)। কিন্তু তারও একদিন চৈতন্য জেগে ওঠে দারুণভাবে। এক গোপন স্থানে শহর থেকে আসা রাজনৈতিক কর্মী তরুণ-তরুণীদের দলটিকে নজরবন্দি করে সে পুলিশে খবর পাঠায় যখন, তখন সে বসে ভাবতে থাকে, 'ওরা কী বলে? বাঁচার কথা—ভালভাবে জীবনধারণ। চাষি জমি পাবে, ফসল ফলাবে। জমিদারি ধ্বংস হবে—অবাধ শোষণের ব্যবস্থাকে খতম করতে হবে, একজোট হয়ে লাগতে হবে তাই, তাই আন্দোলন, তাই বৈঠক। কী স্বার্থ ওদের?

ওই শহরের বাবুদের? কীসের লোভে জীবনকে মাড়িয়ে ফেলে ছুটে এসেছে ওই মেয়েটি। কেন? কেন? কেন?

মস্তিষ্কে আগুন জ্বলে উঠেছে দ্বীপচাঁদের। দালালি জীবনের ঊর্ধ্বে পুরোনো দিনের রেখে আসা জ্বলন্ত স্মৃতি যেন ইস্পাতের মতো ঝলসে উঠেছে ওর মনে। ভুলে গেছে ও সে দালাল, লাঠুয়া!

সেদিনকার চাপা পড়া ঘুমন্ত বিদ্রোহী সর্দার যেন রক্তে গর্জন তুলছে। দ্বীপচাঁদ আজ বেইমানি করবে, সত্যিকারের দালালি। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র জ্বালায় চিৎকার করে উঠল সে—পুলিশ-পুলিশ, পালাও...তারপর ঝড়ের বেগে ছুটে চলল অন্ধকারের ভিতরে।'

এরপর গল্পের নায়ক লাঠুয়া আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। নয়তো পুলিশের হাতেই তাকে মরতে হত। কিন্তু কৃষক-সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে যে শ্রেণী চেতনার জাগরণ তার চিত্তে ঘটেছিল, বাংলা সাহিত্যে তার ছবি অক্ষয় হয়ে থাকবে।

একই রকম শ্রেণীচেতনার প্রকাশ দেখা যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **'বন্দুক'** গল্পের ভূমিহীন চাষি রঘুরাম চরিত্রে। গাঁয়ের চার জোতদার লোকনাথ সাহা, ফজল আলি, নূর মামুদ আর বৃন্দাবন পাল এই চারজন মিলে স্থির করে গ্রামের তেভাগা কৃষক আন্দোলনের নেতা রহমানকে খুন করতে হবে। তার জন্য তারা ঠিক করে ভাড়াটে খুনি পাকা বন্দুকবাজ রঘুরামকে। রঘুরাম ভূমিহীন চাষি। এখন তাড়ি বেচে খায়। কিন্তু তারও যে শ্রেণীচেতনা প্রখর তা বোঝা যায় যখন সে কৌশলে চার জোতদারের বন্দুকগুলি হাসিল করে কৃষক সমিতির হাতে তুলে দেয় আর কৌতুকভরে জোতদারের মুখের উপর জবাব দেয় চাষিদের হাতে তেভাগার ফলে দু-পয়সা এলে তার তাড়িও বিক্রি হবে ভালোই—জোতদারের দালালি করে খাওয়ার প্রয়োজন তার নেই। রঘুরাম কৃষক নেতা রহমানের মূল্য বোঝে, তাই তাকে হত্যার কথা সে ভাবতেই পারে না। সর্বস্তরের নিম্নবর্গের মানুষ ও কৃষকদের এই শ্রেণী-ঐক্য তেভাগা আন্দোলনেরই বিশিষ্ট অবদান।

দ্বিতীয় পর্যায়ের (কৃষক প্রতিরোধের) গল্পগুলির ক্ষেত্রেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **'বন্দুক'** গল্পটিকেই প্রথমে চিহ্নিত করতে হয়। জোতদার লোকনাথ সাহার অনুভবে বর্ণনাটি এরকম—

'...কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে শেষ পর্যন্ত ফণা তুলে উঠেছে কেউটে সাপ। একী কখনো কল্পনাও করা যায় যে শেষ পর্যন্ত এ আপদ তারই ঘাড়ে চড়ে বসতে চাইবে? তিনভাগের দুইভাগ ধান! তার মানে দু-মাস পরে বলবে তিনভাগের তিনভাগই চাই। নাঃ অসহ্য!'

'সত্যিই অসহ্য। লোকনাথ সাহা কান পেতে শুনতে লাগল গ্রামের দিকে কোলাহল উঠছে।'

'জয়ের কোলাহল, আনন্দের কলধ্বনি। ফসল কেটে নিজেদের ঘরে তুলছে ওরা—মহাজন আর জোতদারদের বলে পাঠিয়েছে, দরকার হলে তারা যেন নিজেদের ভাগ নিজেরা এসে নিয়ে যায়।'

কৃষকদের এই আত্মশক্তির উদ্বোধন ও আত্মপ্রত্যয় দেখা যায় বাংলাদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার আবু ইসহাক্ রচিত তেভাগা-কেন্দ্রিক 'জোঁক' ছোটগল্পে। গল্পকার এই গল্পে একটি রূপকের মাধ্যমে দেখিয়েছেন গ্রাম বাংলার জোতদার-আড়তদাররা

জোঁকের থেকেও কত না ভয়ঙ্করভাবে বাংলার অসহায় চাষিকে শোষণ করে। ধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ এখানে কোনোভাবেই বিবেচ্য নয়। আবু ইসহাক্ দেখিয়েছেন একজন মুসলমান জোতদার ওয়াজেদ আলির ছেলে ইউসুফ কীভাবে আর একজন মুসলমান, পাটচাষি ওসমানকে শোষণ করে। ইসলামি ভ্রাতৃত্বের নয়, সম্পর্ক এখানে শুধুমাত্র শোষক ও শোষিতের। পাটচাষি ওসমান ভাগে চাষ করে যে ফসল ফলিয়েছে তার দু-ভাগ নিয়ে নেয় জোতদার। প্রথমে অবশ্য ফসল তিনভাগ হচ্ছে দেখে ওসমান ভেবেছিল তবে বোধহয় দেশে তেভাগা আইন পাশ হয়ে গেছে। কৃষক ফসলের দু-ভাগ পাবে—আর মালিক পাবে এক ভাগ। কিন্তু উল্টোটা ঘটতে দেখে ওসমান যায় জোতদার ইউসুফের বৈঠকখানায়। লাভ হয় না কিছুই, বাপের মতোই ইউসুফও একজন চাষির রক্তচোষা জোঁকে পরিণত হয়েছিল—সে ওসমানকে তাড়িয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রতারিত চাষি ওসমান মুখ বুঁজে থাকে না। মাথা হেঁট করে ফিরে আসার পথে দেখা করিম গাজির সঙ্গে। তাঁর কথা শুনে নিরীহ কৃষক ওসমানেরও রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে। ছেলের হাত ধরে, মেরুদণ্ড সিধা করে সে বলে, 'হ, চল্। রক্ত চুইস্যা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।'

যুগযুগান্ত শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের এই যে রুখে দাঁড়ানো—তেভাগা আন্দোলনের এটাই প্রকৃত সাফল্য। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি যে সাফল্যের অন্যতম অংশীদার। কৃষক প্রতিরোধের এমন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় তেভাগা সম্পর্কিত অধিকাংশ গল্পেই—বিশেষ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'হারানের নাত জামাই'** নামক বিখ্যাত গল্প ও সমরেশ বসুর **'প্রতিরোধ'**-এ।

তৃতীয় পর্যায়ের (অর্থাৎ পারিবারিক অনুশাসন ও সামাজিক রক্ষণশীলতা বিরোধী) গল্পগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য **'সলিমের মা'**, **'অরণ্যের স্বপ্ন'** ও **'কমরেড'** গল্প তিনটি। তেভাগা-কৃষক আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গ্রামবাংলার রক্ষণশীলতার কৃত্রিম আবরণ ফেলে দিয়ে নতুনতর প্রগতি-চেতনায় সমৃদ্ধ হতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। কৃষক সমিতির রক্তলাল পতাকার তলায় ঐক্যবদ্ধ বাংলার হিন্দু-মুসলিম কৃষক পরিবার সকল প্রকার পশ্চাদ্‌পদ মানসিকতা, সামাজিক কু-আচার ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজে লালিত মূল্যবোধ ঝেড়ে ফেলে তখন গড়ে তুলছে এক নতুন ধারার সামাজিক সংস্কৃতি। তুলনামূলকভাবে কিছুটা পশ্চাদপসর মুসলমান সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। পারিবারিক অনুশাসন ও ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিন্ন করে তারাও যে শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠেছে—বেঁচে থাকার ও অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে তার অতুলনীয় ছবি আঁকা হয়ে গেছে—কথা সাহিত্যিক ননী ভৌমিকের রচিত ছোটগল্প 'সলিমের মা'-তে।

মাত্র দু-দিনের জ্বরে শিশুসন্তান সলিম মারা গেলে বে-আব্রু সলিমের মা ধূলামাটিতে পড়ে লুটোপুটি করে কেঁদেছিল—রাত্রে যখন সলিমের মার চোখে ঘুম নেই সন্তানের কবরে কুকুর শেয়ালের হামলার আশঙ্কায়—যখন সে স্খলিত বসনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে যেতে চায় মাটি-চাপা সন্তানের লাশের নিরাপত্তায় তখন সান্ত্বনায় নয়, সলিমের মায়ের কান্না থমকে গিয়েছিল স্বামী মঈনের এক প্রচণ্ড চাষাড়ে

ধমকে—'দুনিয়ার মানুষের সামনে উদলা হয়ে কাঁদিস তুই? পরধানের বাড়ির বৌ—!'

সেই সলিমের মা যখন নিজেদের ভাগের ফসল রক্ষায় জোতদার করম আলির লাঠিয়াল বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে বেইজ্জত হয় (দেখাই যাচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামে কোনো ধর্মীয় ভেদাভেদ নেই)—তখন কিন্তু তার স্বামী নিজের বিবির মাথায় রাখে সহানুভূতি আর বরাভয়ের হাত। এক ধাক্কায় মঈনের মন থেকে খসে পড়ে সামাজিক অনুশাসন ও ধর্মীয় গোঁড়ামির শৃঙ্খল। একজন মুসলমান রমণীর আব্রু রক্ষার থেকেও তখন অনেক বড় হয়ে ওঠে অত্যাচারী জোতদারের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের অঙ্গীকার। শুধুমাত্র সলিমের মা নয়। তার আগের প্রজন্ম সলিমের দাদিও (মঈনের মা) যে এই নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন—তার চিত্রও অসামান্য এই গল্পটিতে অঙ্কিত।

সৌরি ঘটক তাঁর বিখ্যাত দুটি গল্প **'কমরেড'** (১৯৬০) এবং **'অরণ্যের স্বপ্ন'** (১৯৬১)-তে তেভাগা কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক রমণীদের আত্মমর্যাদার উদ্বোধন ও চেতনার জাগরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এ যেন আন্দোলনের মধ্যে এক আন্দোলন। কৃষক সমাজের শত্রু এখানে রক্ষণশীলতা, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ—এবং এই সংগ্রামী পরীক্ষাতেও তেভাগা প্রভাবিত গ্রামাঞ্চলের কৃষক পুরুষ-রমণী সম্মানে উত্তীর্ণ। ইতিমধ্যেই ইতিহাসবিদ ডঃ সুনীল সেন, রাণী দাশগুপ্ত, পিটার কাস্টার্স প্রমুখ তেভাগা সংগ্রামের বিশিষ্ট গবেষকদের রচনায় বাংলার গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্গের জনসাধারণের বিশেষ করে নারীসমাজের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক আচার-আচরণ-বিরোধী যে সমাজতান্ত্রিক ধারা সৃষ্টি হয়েছিল—তার বিবরণ রয়েছে। সন্দেহ নেই তেভাগা কৃষক আন্দোলন এইভাবে আরেক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিল। তেভাগা আন্দোলন নিঃসন্দেহে গ্রাম বাঙলার কৃষক ঘরের মেয়ে-বৌকে সামাজিক নিষ্পেষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল। পুরুষদের মধ্যেও যে নারীকে সম অধিকার প্রদানের বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারী নেতৃত্বের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু তাকে সাহিত্যের দর্পণে প্রতিবিম্বিত করার কৃতিত্ব অবশ্যই সৌরী ঘটকের। 'কমরেড' গল্পটি (এবং 'অরণ্যের স্বপ্ন'ও) লেখা হয়েছিল তেভাগা সংগ্রামের অন্তত পনেরো বছর পরে। কিন্তু এর ভাষা, বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি এত জীবন্ত যে মনে হয় পাঠকও যেন ঘটনাকেন্দ্রের মধ্যে উপস্থিত একজন প্রত্যক্ষদর্শী। গল্পের বিষয়বস্তু সূচনার প্রথম অনুচ্ছেদটিতেই বিবৃত—

'কৃষক সমিতির কর্মী কালীপদ মুচির নামে তার বৌ সুন্দরী নালিশ করেছে সমিতির অফিসে। অকারণে কেন তাকে কালীপদ মেরেছে তার বিচার করতে হবে। শেতলডাঙা গাঁয়ে শীতকালে এক সন্ধ্যাবেলায় সেই বিচার সভা বসেছে।'

বলাবাহুল্য এমন অভাবনীয় কাণ্ড গাঁ-গঞ্জে এই প্রথম। পতিসেবার ঘাটতি হলে চড়-থাপ্পড়, দু-চার ঘা তো সকল স্ত্রীরই প্রাপ্য। তার জন্য অভিযোগ সমিতির কাছে। তার আবার বিচার! কালীপদ কৃষক সমিতির একজন ছোটখাটো নেতা তার বক্তব্যটাও তো আর ফেলনা নয়।

শেষ পর্যন্ত বিচার সভায় কালীপদ দোষী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু আসল নাটক তোলা থাকে তার ঘরে—যেখানে চোখের জলে আর প্রেমালিঙ্গনে কৃষক বধূর সঙ্গে তার অভিযুক্ত স্বামীর মিলন হয়।

'অরণ্যের স্বপ্ন' গল্পটি অবশ্য একটু সিরিয়াস ধর্মী। তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্য এক সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা ভিন্নতর জীবনবোধ উত্তরণের কাহিনী এটা। তেভাগা কৃষক সংগ্রামে চাষি পরিবারের ব্যাপক মেয়েদের অংশগ্রহণ নতুন কথা নয়। জোতদার-জমিদার-পুলিশ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে তাদের সহ্য করতে হয়েছে পাশবিক অত্যাচার। তার কিছু বিবরণ এই গল্পে ফিরে আসে। মিলিটারির লাথিতে নিত্যর ভ্রূণ নষ্টের উল্লেখ সৌরী ঘটকও করেছেন। কিন্তু এই গল্পের মূল কেন্দ্রীয় থিম বা বিষয়টি হল ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ ও সভ্যতার একটি প্রাচীনতম নারীকেন্দ্রিক সংস্কার—'সতীত্ব'। আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী নারী-কর্মী ও নেত্রীরা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে পুলিশ-মিলিটারি লাটদার-জোতদারদের হাতে প্রায়শই হয়েছে ধর্ষিতা-নির্যাতিতা। পাশবিক যৌন নিপীড়ন চালানো হত তাদের উপর। তেভাগা সংগ্রাম চলাকালীন এরকম ঘটনা বহু ঘটেছিল। এদের সম্পর্কে সমাজ কি ভাবত? কৃষক সমিতির দায়বদ্ধতাই বা কোথায়? এই তীব্র সামাজিক প্রশ্নগুলির মুখোমুখি গল্পকার পাঠকদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। দাঁড় করিয়েছেন কৃষক সমিতির সংগ্রামী নেতৃত্বকেও।

গল্পটি এরকম—কৃষক সমিতির অন্যতম নেতা হরিপদর পুত্রবধূ পাখি। সাতদিন আগে জমির পাকা ধানের উপর হামলা রুখতে গিয়ে মিলিটারির হাতে ধরা পড়া বাইশ বছরের যুবতী ধর্ষিতা পাখিকে কাল আবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছে গাঁয়ের কাছে। তাকে বাঁচাতে হলে সেখান থেকে অবিলম্বে সরিয়ে আনা দরকার। কিন্তু তা করতে নারাজ শ্বশুর হরিপদ। তার বক্তব্য চিকিৎসার সব খরচ দিয়ে সে রাজি কিন্তু ধর্ষিতা পুত্রবধূকে সে ঘরে নিতে পারবে না। তার কুল নষ্ট হবে। তরুণ কৃষক কর্মীরা খেপে আগুন। তাহলে তো কোনো কৃষক মেয়েই আর আন্দোলনে আসবে না। হরিপদর এক গোঁ—ধর্ষিতা মেয়ে নিয়ে কৃষক সমিতি করা চলে, তাকে ঘরের বউ করা চলে না।

গল্পকার টানটান উত্তেজনা এবং ঠাসবুনোট সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন কৃষক আন্দোলনের এই অভ্যন্তরীণ সংকটকে রূপদান করেছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রাচীনপন্থী হরিপদর পরাজয়ই ঘটল, জয়ী হল নতুন জীবনবোধ, নব প্রজন্ম। নির্যাতিতা-ধর্ষিতা পাখি অবশেষে তার নিতান্ত আশ্রয় খুঁজে পেল স্বামীর বুকে। হরিপদর বিনয়ী ছেলে গুণধর অবশেষে বাপের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে ঘরে স্থান দিল। আন্দোলনের ভিতর আরেক নতুন আন্দোলন জয়ী হল।

চতুর্থ পর্যায়ের গল্পে কৃষক রমণীদের তেভাগা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ। আমরা জানি দিনাজপুরের চিরির বন্দরই হোক, কিংবা খাঁপুর, হুগলির ডুবিরভেরী হোক কিংবা সুন্দরবনের কাকদ্বীপ সর্বত্রই তেভাগা আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলি বা জোতদারের লাঠিতে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রাণ দিয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন কৃষক রমণীরা। ময়মনসিংহের হাজং রমণী রাসমণি থেকে কাকদ্বীপের চন্দন পিঁড়ির অহল্যা, বাতাসী, সরোজিনী, উত্তমী—আজ পর্যন্ত বাংলার কোনো আন্দোলন সংগ্রামে এত নারী জীবন বিসর্জন দিয়েছেন বলে জানা যায় না। কৃষক রমণীদের সেই বীরত্ব নিয়ে আজ তেভাগা সংগ্রামের

দেশি-বিদেশি বহু গবেষক গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেছেন। এঁদের এই আত্মদান অনুপ্রাণিত করেছিল বাংলার সাহিত্যিক-গল্পকারদেরও। তেভাগা কৃষক সংগ্রামে নানাভাবে ও ভঙ্গিতে কৃষকরমণীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এঁরা অমর করে রেখেছেন তাঁদের রচিত ছোটগল্পগুলিতে। বউ, প্রতিরোধ, জয়দ্রথ, চৈতালী আশা ('ব্যান্ডেজ') গল্পগুলি এরকমই কিছু রচনা।

সুশীল জানার গল্প 'বউ'তে কৃষক আন্দোলনের কর্মী অর্জুনকে পুলিশ ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে! মায়ের ইচ্ছায় বিয়েটা সেরে নিতে গোপনে বাড়ি ফিরেছিল অর্জুন। নতুন বউয়ের সঙ্গে কাটিয়েছে সে মাত্র একটিই দুর্লভ রাত্রি। ফুলশয্যার পরে ভোর রাত্রেই পুলিশ তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অর্জুন চেষ্টা করে পালাতে। পুলিশ তোলে বন্দুক। শেষ মুহূর্তে ছুটে এসে বন্দুকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে অর্জুনের নবপরিণীতা বধূ। তার আশা ও স্বপ্নের সমাধি রচিত হয়। গল্পকার শেষ ছবিটি এঁকেছেন এইভাবে—

'বুকের কাছে হলুদ শাড়ির ওপরে বুলেট ভেদ করে যাওয়ার চিহ্ন। হলদে শাড়ির হলুদ রঙে লেগেছে পোড়ার দাগ। অর্জুন চেয়ে আছে—ওইখানে কাল সে পাগলের মতো মাথা গুঁজেছিল না।'

এটা যদি নিছকই পতিপরায়ণা নব পরিণীতা বধূর অচেতন আত্মদান মাত্র বলে কেউ ভাবেন তবে পাঠ করতে হয় সমরেশ বসুর 'প্রতিরোধ' গল্পটি। সমরেশ বসুর লোকায়ত কলমে গাঁয়ের সর্বজনপ্রিয় কবিয়াল সুবল সখার প্রত্যক্ষ দর্শনে সেই রক্তাক্ত বৃত্তান্ত এই ভাষায় ফুটে উঠেছে।

'রাধা গর্জে ওঠে, 'আমি শিবদাস মোড়লের মাইয়া না? ধান কাড়বনি আমার কাছে থেইক্যা? কত মায়ের দুধ খাইছে ঢ্যামনরা দেইখ্যা লমু। তুমি যাও গা—দেরি কইরো না।'

সুবল কোথাও যেতে অস্বীকার করে। মনাইয়ের কানে কানে বলে, 'তোমার বউ যে পোয়াতি, আমারে দেখতে হইব না?'

'হ?' মনাইও আবার বেঁকে বসে। বলে, 'তবে আর যামুনা। পরাণ দিতে হয় এখানেই দিমু।'

কিন্তু রাধা দৃঢ় গলায় আপত্তি জানায়, 'তোমারে ধইরা লইয়া যাইব যে! তুমি থাকতে পারবা না—যাও।' জোর করে সে মনাইকে সরিয়ে দেয়। তারপর সবাই রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করে থাকে। সমস্ত গ্রামটাই প্রতীক্ষা করে থাকে অনিবার্য লড়াইয়ের দৃঢ় প্রতিরোধের জন্য। শত্রুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে সবাই। জ্ঞান কবুল, তবু ধান ছাড়বে না কেউ। এ-তাদের অভাব-অনটন রোগ-শোককে ছাড়িয়ে বাঁচার অভিযান।'

শেষ পর্যন্ত পুলিশ সঙ্গে নিয়ে জোতদারের লাঠিয়াল বাহিনী আক্রমণ করে গ্রাম। জ্বালিয়ে দেয় কৃষক সমিতির অফিস। খুন করে রহিমকে। উলঙ্গ, মানুর বউকে তাড়া করে আসে পশুর দল। তারপর 'মার-মার...'

বহুদূর থেকে মেয়েরা ছুটে আসছে দা কুড়ুল লাঠি ঝাঁটা যা পেয়েছে তাই নিয়ে।

সর্বাগ্রে রহিমের বউ—হাতে কাটারি। আশ্চর্য। একদিন পেটের জ্বালায় রহিমকে ছেড়ে না সে অপরকে নিকা করেছিল। অপরের পর্দানশীন বিবি সে।

ডাকাতগুলি ততক্ষণে ধরে ফেলেছে মানুর বৌকে। ইশ্! পাশবিক ধর্ষণের এমন বীভৎস রূপ কল্পনা করতে পারে না সুবল। ধান কাটা মাঠে শক্ত খোঁচা খোঁচা ডাঁটাগুলোর উপর ফেলে হিংস্র কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল সব। ভোরের স্পষ্ট আলো ঝাপসা হয়ে আসে সুবলের চোখে। পীতাম্বর সা'র উল্লসিত মুখটা কুৎসিত অট্টহাস্যে কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।'

মেয়েদের প্রতিরোধের মুখে নররাক্ষস পীতাম্বর সা দলবল সহ পুলিশ নিয়ে আবার গ্রামের মধ্যে ঢোকে। রাধা একলা রয়েছে মনে হতেই সুবল ছোটে গাঁয়ের দিকে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে না। থেকে থেকে বন্দুকের শব্দে গোটা গ্রাম কেঁপে কেঁপে ওঠে। সেই সঙ্গে সুবলের বুকও। ছুটে গিয়ে দেখে ধান বাঁচাতে গিয়ে বন্দুকের গুলিতে অন্তঃসত্ত্বা রাধার শরীর লাশ হয়ে গেছে।

তেভাগা আন্দোলন দমনে সরকারি দমননীতির নারকীয় বিবরণ সমরেশ বসু যা দিয়েছেন একমাত্র তাঁর পক্ষেই বোধহয় তা দেওয়া সম্ভব। সন্দেহ নেই কাকদ্বীপের শহীদ অন্তঃসত্ত্বা অহল্যার স্মৃতি লেখকচিত্তে সদা জাগরিত ছিল।

সাহিত্যিক সুশীল জানার আরো একটি ছোটগল্প 'বেটি'। লেখকের 'বউ' গল্পটির মতনই এমন একটি দুর্লভ নারী চরিত্রের বেদনাময় ইতিবৃত্ত এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে—যার আন্দোলনে অংশগ্রহণের কথা নয়—কিন্তু গোটা গ্রামকে অবাক করে দিয়ে সে তা করেছিল নিজের জীবনের বিনিময়ে চরমতম ক্ষতি স্বীকার করেও। হতভাগ্য পান্তিকে পুরুষশাসিত সমাজের সকল অত্যাচার-অবিচার ও দংশনের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে আজন্ম। বাপ তাকে অর্থোপার্জনের উপকরণ রূপে শোষণ করেছে। পুলিশ আর জমিদারের দালাল প্রেমিক সেজে তাকে প্রতারণা করেছে, এমনকি আন্দোলনরত গ্রামবাসীরা পর্যন্ত পান্তিকে শত্রুশিবিরভুক্ত ভেবে অবিশ্বাস ও ঘৃণা করেছে। কিন্তু ধান লুঠের পর গাঁয়ের সকল মরদ যখন পলাতক—পুলিশ পান্তিকেই নিয়ে গেল টানতে টানতে। দালাল হারাধনের বায়না করা (অগ্রিম অর্থ পান্তির বাপকে দিয়েছিল হারাধন) ভাবী বউ পান্তি—সকলে ভাবল হয়তো নাম বলে দিয়েছে সে সকলের—মায় তার বাপের নামটি পর্যন্ত—এবারে হুলিয়া আসবে একেবারে। এবার কাহিনীর শেষ অংশ।

'কিন্তু হুলিয়া এল না কারুর নামে—এল পান্তি। কে একটা ভূতের মতো নিশাচর লোক অন্ধকারে লালগঞ্জের ভেড়ি বাঁধের উপর যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল তিনদিন পরে গ্রাম সীমান্তের খালের সাঁকোর কাছে। গোরু ভাগাড়ে নিয়ে যাওয়ার মতো করে বাঁশে হাত পা বেঁধে সাঁকোর ধারে ফেলে গেছে পান্তিকে। সে কারুর নাম বলেছিল ছিল কিনা কে জানে তবে জিভটা তার মুখের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে এক পাশ দিয়ে, বাঁ চোখটা ফুলে উঠেছে না চোখের ডিমটা বেরিয়ে পড়েছে ঠেলে তা অন্ধকারে বোঝার উপায় নেই, ফুলে ফেঁপে গোদা হয়ে গেছে পা দুটো—হয়ত ঝুলিয়ে রেখেছিল কোথাও। বাঁশ থেকে তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে ভূতের মতো সেই

লোকটা দাঁড় করাতে গেছল পান্তিকে—দুম করে সে পড়ে গেল উল্টে। তবু প্রাণ ছিল—কারণ ককিয়ে উঠেছিল যেন। ঝিমানো ডান চোখটায় সমস্ত শক্তি দিয়ে পরম আগ্রহে চেয়ে দেখেছিল—লোকটা কি তার বাপ, না সেই ছোকরা চাষিটি—যে একদিন রাতে তাকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল—চিনতে পারল না।'

ননী ভৌমিকের স্বল্প-পরিচিত গল্প 'বাদা'ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সুন্দরবনের লাটদার-জোতদার শাসিত শোষণব্যবস্থা ও তার সামনে কৃষকের প্রতিকারহীন অসহায়তার চিত্র। 'বাদা'র অন্ধ কন্যা ও সুশীল জানার 'বেটি' একই অবিচারের শিকার। তেভাগা কৃষক সংগ্রামের সবচেয়ে গৌরবোজ্বল বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে ছিল কৃষক পরিবারের নারীদের ব্যাপক, সচেতন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। আবার নারীদেরই উপর নেমে এসেছে সামাজিক-রাষ্ট্রিক ও পারিবারিক বহুমুখী শোষণ ও নির্যাতন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'হারানের নাতজামাই'** বিখ্যাত গল্পটির কথা সকলেরই জানা। কৃষক নেতা ভুবন মণ্ডলকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য গ্রামের সাধারণ এক কৃষকরমণী ময়নার মা নিজের মেয়ের ঘরে জামাই সাজিয়ে ভুবন মণ্ডলকে রাত কাটাতে পাঠিয়েছিল। পুলিশ ভুবনকে ধরতে এসেও খুঁজে পায়নি। তেভাগা অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলে তখন কৃষকমেয়েদের এই চেতনার উত্তরণ ছিল সেই সময়ের এক ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম কৃষক নেতা হেমন্ত ঘোষালের প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে। এক্ষেত্রে হেমন্ত ঘোষালকে অসুস্থ স্বামী সাজিয়ে সারা রাত্রি তাঁর সঙ্গে এক শয্যায় থেকে সে যাত্রা পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন আরেক কৃষক রমণী। 'হারানের নাতজামাই' (৪ জানুয়ারি ১৯৪৭, পূর্বাশায় প্রকাশিত) গল্প রচনার অনেক পরের ঘটনা হেমন্ত ঘোষালের অভিজ্ঞতা। এর থেকে বোঝা যায় কৃষক রমণীদের মধ্যে এই জাতীয় শ্রেণীচেতনার ধারা ক্রমবিকাশমান ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'** গল্পটিতেও (প্রথম প্রকাশ 'শারদীয় সংবাদ', ১৯৪৮) নিরীহ কৃষক বধূটি সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মানিকবাবু তেভাগা কৃষক আন্দোলন নিয়ে যত গল্প লিখেছিলেন (সব গল্প বোধহয় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি) এবং তার চেয়েও বেশি তার ডায়েরিতে যত গল্পের প্লট ভেবে ও লিখে রেখেছিলেন (সব প্লটই শেষ পর্যন্ত ছোট গল্পের রূপ পায়নি), তার নজির বাংলা সাহিত্যে আর আছে কিনা সন্দেহ। এরকম দুটি গল্প 'জয়দ্রথ' (১৯৪৭ সালে প্রফুল্ল গুহ সম্পাদিত 'সোনার বাংলা'য় প্রকাশিত) ও **'ব্যান্ডেজ'** ('চৈতালী আশা' রূপে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র রবিবারের 'স্বাধীনতা', ১৯৪৭-এ প্রকাশিত)। এই গল্পটি দীর্ঘদিন বিস্মৃত থাকার পর সম্প্রতি অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য উদ্ধার করেছেন বলে জানা গেছে। তেভাগা কৃষক সংগ্রামে নারী-সমাজের অংশগ্রহণের চিত্রটি সুস্পষ্ট।

'জয়দ্রথ' গল্পটির প্লট ছিল এরকম—গাঁয়ের পুরুষেরা রাতে মাঠে গেছে রাতভোরে ধান কেটে সরিয়ে নিতে (তেভাগা আন্দোলন)—কুটুম এল—একলা বৌটিকে অপমানের চেষ্টা—গাঁয়ের মেয়েদের দ্বারা শাস্তি—জোতদারের সাহায্যে (জয়দ্রথের যেমন মহাদেবের বরের সাহায্যে) লোকজন পুলিশ এনে গ্রামে হানা।

'চৈতালী আশা' বা **'ব্যান্ডেজ'** গল্পটির প্লট ছিল এইপ্রকার চাষি বৌয়ের একখানা

যত্নের কাপড় প্রাণের সমান-তোলা থাকে—উৎসবে পরে যাবার সাধ—পুলিশের গুলিতে আহতদের জন্য সেই কাপড় ছিঁড়ে ফেলতে হল আহত কৃষক কর্মীর পরিচর্যার জন্য—এই শ্রেণীচেতনার জাগরণ শরৎচন্দ্র-অঙ্কিত দয়াময়ী রমণীদের স্মরণে রেখেও বলা চলে বাংলা সাহিত্যে বিরল।

পঞ্চম পর্যায়ে তেভাগা-কেন্দ্রিক কিছু গল্প রচিত হয়েছিল আন্দোলন চলাকালীন সময়ের পুলিশী সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় ও জোতদারের দমনপীড়ন ও কর্মীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের থমথমে পটভূমিকায়। উল্লেখযোগ্য গল্প 'হাউস', 'প্রতিরোধ', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রভৃতি।

মিহির সেন রচিত 'হাউস' গল্পটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে তেভাগা আন্দোলনের উপর পুলিশী অত্যাচারের বিবরণ তুলে ধরেছে। ভাগচাষী ডোমার, বউ নীলমণি, ছোট্টছেলে পোহালু। পোহালুর বড় হাউষ (সাধ) ছিল শহর দেখবে। সেই শহর দর্শন তার হল, কিন্তু বাপের কোলে মাথা রেখে, পুলিশের গাড়িতে বন্দি অবস্থায়। পোহালু তখন এক মৃত্যুপথযাত্রী—তেভাগা আন্দোলনের কিশোর সৈনিক। গ্রাম বাংলার শস্যশ্যামল সবুজ প্রান্তরের রণক্ষেত্রে জোতদারের লেঠেলের আক্রমণ থেকে বাপকে বাঁচাতে গিয়ে লাঠির আঘাতে দুই ফাঁক হয়ে গিয়েছিল পোহালুর মাথা, রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল সোনালি ফসল। জাল ঘেরা পুলিশের কালো মারিয়া প্রিজন ভ্যানে শহীদ কৃষক সন্তান পোহালুকে দেখে 'চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে সবার। চোখে জলের চেয়েও জ্বালা বেশি, অক্ষম আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা যেন নেয় গেঁয়ো মানুষগুলো।'

সমরেশ বসুর 'প্রতিরোধ' গল্পে সন্ত্রাসের চিত্র একের পর এক বীভৎস ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। জোতদার পীতাম্বর সা দলবল সহ পুলিশ, বন্দুক নিয়ে গ্রামে ঢোকে ধান লুঠ করতে। প্রথমে শুরু করে নারী ধর্ষণ। মানুর বউকে উলঙ্গ করে তাড়া করে নিয়ে যায় পশুর দল। ধান-কাটা মাঠে শক্ত খোঁচা ডাঁটাগুলোর উপর ফেলে হিংস্র কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে; তারপর লালসা চরিতার্থ করে ঢোকে গ্রামের মধ্যে। ঘরদোর তছনছ, খুনখারাপি, ধরপাকড় চালাতে থাকে অবলীলাক্রমে। নরপশুদের বন্দুকের শব্দে কেঁপে উঠতে থাকে গ্রাম। গুলিতে প্রাণ দেয় কৃষক আন্দোলনের কর্মী মনাইয়ের অন্তসত্ত্বা বধূ রাধা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'তে প্রত্যক্ষভাবে রক্তপাত নেই। অনুপস্থিত 'প্রতিরোধ' বর্ণিত পাশবিক সন্ত্রাসের সেই চিত্র। তথাপি থমথমে পরিবেশে কী অজানা আতঙ্কে টানটান রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় গল্পের মুহূর্তগুলি পার হয়ে যায়। মানিকবাবুর সাহিত্যিক প্রতিভা ও নির্মাণ শৈলীর স্পর্শে জীবন্ত হয়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলনের একটি সময়কাল।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'র পটভূমিকা হুগলির বড় কমলাপুর অঞ্চল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে এই বড় কমলাপুরই 'ছোট বকুলপুরে' পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৪৮-৪৯ সালে এই অঞ্চলে তেভাগার দাবিতে কৃষক সংগ্রাম তীব্রতর রূপ নিয়েছিল। গল্পটিতে তুলে ধরা হয়েছে তারই একটি ছবি। ছোট বকুলপুরের গ্রামে

চলেছে কৃষকদের সঙ্গে জোতদারদের সংগ্রাম। পুলিশ, গোয়েন্দা এবং সরকারি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা গ্রামে যাবার পথে মোড়ে পাহারা দিচ্ছে। পুলিশ দিয়ে গ্রামটিকে প্রায় ঘিরে রাখা হয়েছে বলা চলে। এই রকম একটি অবস্থায় কোনো গরুর গাড়ির গাড়োয়ানই ছোট বকুলপুরে যেতে রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত গগন নামে একটি দুঃসাহসী ছোকরা গাড়োয়ান তার গাড়িতে দিবাকর ও আন্নাকে গ্রামের গ্রামান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যারা এই বিদ্রোহী গ্রামটিকে পাহারা দিচ্ছিল তারা এই আবির্ভাবে বিচলিত হয়ে ওঠে। দিবাকর এবং আন্নার এই স্বাভাবিক আচরণ তাদের কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়। কয়েকদিন ধরে ছোট বকুলপুরে যে ধরনের তাণ্ডব চলেছে তাতে করে কোনো ভীরু ছা-পোষা মানুষ যে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই গ্রামে আসতে চাইবে গোয়েন্দাদের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাদের ধারণা হয় যে কোনো বিপ্লবী নেতা বোধ হয় আত্মপরিচয় গোপন রেখে গ্রামে প্রবেশ করতে চাইছে।

নিজেদের সন্দেহ নিরসনের জন্য তারা দিবাকরদের সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে দেয় যদি কোনো গোপন কাগজপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে দিবাকরের হাতে পানমোড়া ছাপানো কাগজটির প্রতি। স্টেশনে নেমে পানের দোকানে পান কেনবার সময় দোকানদার এই কাগজটিতে মুড়েই দিবাকরকে পান দিয়েছিল। চুনে মাখা সেই নোংরা কাগজটি খুলে গোয়েন্দা বাহিনী আতঙ্কে এবং বিস্ময়ে চমকে ওঠে। এটি একটি ছাপানো ইস্তাহার। 'ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি' শিরোনামায় এই ইস্তাহারে তাদের সংগ্রামের প্রতি জনসমর্থন জানানো হয়েছে। এই রকম একটি মারাত্মক রাজনৈতিক ইস্তাহার যার হাতে সে যে সত্যিই বিপজ্জনক ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই গোয়েন্দা এবং পুলিশ-বাহিনী এই রকম একজন নিরাপদ শত্রুর সন্ধান পেয়ে নিশ্চিন্তবোধ করে।

ড. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, এই গল্পের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্যই হল জোতদার এবং শাসকশ্রেণীর সৃষ্ট সন্ত্রাসের পরিবেশটিকে তুলে ধরায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ কৃতিত্ব। আরো লক্ষণীয় যে, জোতদার, গোয়েন্দা বা পুলিশের লোকেরা যতটা ভয় পেয়েছে সাধারণ মানুষ ততোটা পায়নি। বরং প্রথম দিকে কিছুটা অত্যাচার চালালেও শেষে অত্যাচারীরাই পিছিয়ে গেছে।

'হারানের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' মানিকবাবুর তেভাগা আন্দোলন বিষয়ক সর্বাধিক বিখ্যাত ও প্রচারিত দুটি গল্প। অনেকের ধারণা, তেভাগা প্রসঙ্গে মানিকবাবু বোধহয় মাত্র এই দু-খানিই গল্পই রচনা করেন। তা কিন্তু নয়। উপযুক্ত গল্পগুলি ছাড়া তাঁর রচিত 'গায়েন', 'মাটির মাশুল', 'বাগদি পাড়া দিয়ে' ইত্যাদি ছোটগল্পেও তেভাগা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত উঠে এসেছে।

পাঠক সমাজে আরো একটি ধারণা প্রচলিত যে, 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটি রচনার পূর্বে তিনি বড় কমলাপুরে যান তেভাগা আন্দোলন দেখতে—কিন্তু এই ধারণা কতটা যথার্থ সে বিষয়ে ধনঞ্জয় দাশ, ড. মালিনী ভট্টাচার্য, যুগান্তর চক্রবর্তী প্রমুখ সাহিত্য-গবেষকগণ নিঃসংশয় নন। তাঁদের মতে, বড়ো কমলাপুরে না-যাওয়ার জন্যই সম্ভবত তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সেলের ভারপ্রাপ্ত চিন্মোহন

সেহানবীশের কাছে মানিকবাবু তিরস্কৃত হয়েছিলেন। হুগলির অন্যতম কৃষকনেতা কমল চট্টোপাধ্যায়ের মতে মানিকবাবু তিরস্কৃত হয়েছিলেন।

হুগলির অন্যতম কৃষকনেতা তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গিয়েছিলেন ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে, অথচ মানিকবাবুর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে গল্পটির হুবহু প্লট লিখিত হয়েছিল 'পদাতিক' নামে, ১৯৪৬-এর গোড়ায়, যদিও এটি প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয় 'সংবাদ'-এ ১৯৪৮ সালে। যাই হোক মানিকবাবু গিয়েছিলেন কি যাননি—এটা খুব একটা বড়ো বিষয় নয়, গল্পটি যে শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছিল তাতে সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ নেই। তবে ১৯৪৮-৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি তার সাহিত্যিক-সদস্যদের গণআন্দোলন ও সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের বিষয়ে যে কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন চিন্মোহন স্নেহানবীশের মানিকবাবু-বিষয়ক স্মৃতিচারণই তার প্রমাণ (দ্র. *৪৬ নম্বর ঃ একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*)

আলোচনার ষষ্ঠ পর্যায় তেভাগা আন্দোলনে আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের এবং ভাগচাষি নয় এমন অংশের কৃষক-সমাজেরও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে। এর কিছুটা আলোচনা প্রথম পর্যায়ে আমরা করেছি 'মন্ত্রশক্তি' 'দালাল' কিংবা 'বন্দুক' গল্পটি আলোচনা করতে গিয়ে। উত্তরবঙ্গে, বিশেষত দিনাজপুরে এবং বাংলার অন্যত্রও সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষক সমাজ তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। ননী ভৌমিক তাঁর বিখ্যাত দুটি গল্প 'ধানকানা' ও 'আগন্তুক'-এ সে-সময়ের জীবন্ত ছবি এঁকে রেখেছেন।

প্রথম গল্পটিতে সাঁওতাল ভাগচাষিদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। জমি বন্ধক রাখা, ভূমিহীন চাষি আঁধার দিনমজুরি করে একটা-একটা করে পয়সা জমায় জমি উদ্ধারের আশায়, জোতদারের ধান কাটে আঁধাররা, কিন্তু তাদের রক্তে দ্রিমি দ্রিমি বাজে সাঁওতালি মাদলের বাদ্য। অবাক বিস্ময়ে তারা সাঁওতালদের বীরত্বকাহিনী শোনে লেখকের ভাষায়—

'ওই গাঁয়ের সাঁওতাল আধিয়াররা ধান কেটে নিজেদের খোলানে তুলেছে, জোতদারকে সাফ বলে দিয়েছে যে ধান ওরা নিজেরাই ভাগ করবে। সুদ দেবে না, আবোয়াব দেবে না তারই গল্প।' ...সারা বছর ধরে ধান গাছ বড় করে তুলে, সেই ধান ফলানো গল্প নতুন জ্বালানি চাপিয়ে ফুঁ দেয় আগুনে; লাল আভায় টিক টিক করে চোখ।'

'সাঁওতালরা বিষ মাখিয়ে রেখেছে তীরের ফলায়—কীভাবে আঁধার জিজ্ঞেস করে—আইনটা তাহলে কার পক্ষে। জোতদারের পক্ষে। মোকদ্দমায় ডিক্রি হবে ওরা। কিন্তু সাঁওতালরা তবু বলে, ধান দিব কেনে।'

এই 'ধান দিব কেনে'-চেতনা ও বোধ, এরই অন্যতম পরিচয় পাওয়া যায় ননী ভৌমিকের অপর গল্প **'আগন্তুক'**-এ। এখানে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ কিছুটা প্রচ্ছন্ন, কিন্তু দৃঢ়তায় তারা অটল। গল্পটির বিষয়বস্তু এরকম—লালঝাণ্ডার কর্মী মুরারি শালবনিতে আসে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করতে। সেখানে সে পরিচিত 'ঠাকুর' নামে। শহর থেকে আসা শিক্ষিত যুবকরা গাঁয়ে কৃষক আন্দোলন করতে এসে কত ভুল

করেছিল—আবার কীভাবে আপনজন রূপে কৃষক সাধারণের ভালোবাসাও পেয়েছিল—তার বিবরণ, বিশ্লেষণ রয়েছে এই গল্পে। এই শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ও ভালোবাসা পেয়েছিল বলেই জেল খেটে গ্রামে ফিরে আসে মুরারি। সরকারি সন্ত্রাসে বিধ্বস্ত গ্রামে পুনরায় সংগ্রামের সাথীদের খুঁজে পায়—আবার তাদের জোটবদ্ধ করতে পারে। অতীতে ব্যর্থ কৃষক আন্দোলন এইভাবে আর এক সংগ্রামের বীজ বোনে।

তবে মুরারি নয় সাঁওতাল কৃষকদের সাহস, আত্মদান ও সংগ্রামে অংশগ্রহণের রক্তাক্ত বিবরণ এই গল্পের প্রধান উপজীব্য। সাঁওতালরা তাদের কথা রেখেছিল—মুরারির কথায় তারা প্রাণ দিয়েছিল অকাতরে। সমকালীন কথাসাহিত্যিক ননী ভৌমিকের অভিজ্ঞতায় তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এক শহুরে কমিউনিস্টের (মুরারি) আত্মবিশ্লেষণ ফুটে উঠেছে এই ভাষায়—

"রাঢ়ের এই দুর্গম অচলায়তনকে দুই হাতে টেনে হিঁচড়ে বদলে দিতে চেয়েছিল মুরারি। জেলখানায় প্রথম সে অনুভব করল—সে নিজে বদলে গেছে। সে কোনোদিন ভাবেনি তার চোখ দিয়ে জল বেরতে পারে। কিন্তু যখনই সে ভেবেছে এই সরল বিশ্বাসী কালো মানুষগুলোর কথা, তখনই কেন জানি গলা বুজে এসেছে একটা যন্ত্রণাকাতর কান্নায়। ধিক্কার জেগেছে নিজের ওপরে—ওরা ভেবেছিল মুরারি তাদের নিয়ে যেতে পারবে তাদের স্বপ্নের দিকে, কিন্তু মুরারি পারেনি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ওরা মুরারির ওপর যতটুকু আস্থা রেখে গুলির মুখে এগিয়ে গিয়েছিল, মুরারি তার সমান হয়ে উঠতে পারেনি। মুরারির আহ্বানে সরল-সাহসী সাঁওতাল কৃষকরা এগিয়ে এসেছিল লড়াই সংগ্রামে অংশ নিতে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল সঠিক নেতৃত্ব দিতে।"

মুরারির উপযুক্ত আত্মসমালোচনা আসলে তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতৃত্বের আত্মসমীক্ষারই একটা অংশ—যারা বাংলার তেভাগা সংগ্রামে প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে সঠিক নেতৃত্ব দিতে সফল হয়নি। অবশ্য এটি একটি ঐতিহাসিক বিতর্কের বিষয়।

তেভাগা কৃষক সংগ্রামে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল অবিভক্ত বাংলার উনিশটি জেলার প্রায় ষাট লক্ষ ভাগচাষি। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ আত্মঘাতী দাঙ্গার কলঙ্ক মুছে ফেলে গ্রামে-গঞ্জে কৃষক-সমাজ নভেম্বর-ডিসেম্বরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়েছে তেভাগার দাবি ছিনিয়ে আনতে। সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সংহতি ছিল তেভাগা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। হাজার চেষ্টা করেও শ্রমজীবী মানুষের এই সাম্প্রদায়িক ঐক্য ভেঙে ফেলা জোতদার-জমিদারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উপরন্তু যে সকল অঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সেসব অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোনোমতেই ঘটতে পারেনি—এটা অবশ্যই উল্লেখ্য। ছোটগল্প বিষয়ে আলোচনা শেষ পর্যায়ে এই বিষয়টিই আলোচিত হবে। সাধারণত আলোচ্য প্রায় সব গল্পেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়টি ছিল, কিন্তু বিশেষ কয়েকটি গল্পে বিষয়টি সুস্পষ্ট। যেমন—'বন্দুক', 'জোঁক', 'সলিমের মা', 'বাগদি পাড়া দিয়ে' প্রভৃতি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'বন্দুক' গল্পে লোকনাথ সাহা, বৃন্দাবন পাল, ফজল

আলি, নূর মামুদ এই চারজন জোতদার হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। জোতদাররা আলাদাভাবে কৃষকদের ডেকে বলেছিল 'আল্লার নামে, ভগবানের নামে ভেবে দেখ, তোরা কী করতে যাচ্ছিস। চাষাদের পক্ষ থেকে রহমান জবাব দিয়েছিল, যা করেছি আল্লার নামে, ভেবেই করেছি। গায়ে গতরে একটু আঁচড় লাগবে না বাবু, জমির ভালোমন্দের দিকে একবার তাকাবে না, অথচ থাবা দিয়ে অর্ধেক ধান গোলায় তুলে নেবে। নিজেরাই একবার ইমানের দিকে তাকিয়ে দেখ, কোনটা হক আর কোনটা বেইমানি।

ফজল আলির আর সহ্য হয়নি। গর্জে বলেছিল, খুব হক আর বেইমানি বোঝাচ্ছিস। ওরে, মোছলমানের বাচ্চা হয়ে হিন্দুর ফাঁদে পা দিলি। লজ্জা হয় না!

রহমান শুধু হেসেছিল। বাধা দিয়ে বলেছিল, 'মোছলমান গরিব, হিন্দু গরিবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পেটের ভাতের জন্য লড়াই করতে গুনাহ্ হয়, আর হিন্দু জোতদারের সঙ্গে দোস্তি করে মোছলমানের ভাত মারলে সেটাই বুঝি বড় ভাল কাজ হলো? বোকা বুঝিও না সাহেব যাও, যাও—নিজের কাজে যাও—'

দুনিয়াতে হিন্দু-মুসলিম-শিখ-ঈশাই-এর বিভেদ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয় শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ভাঙতে। উপরতলায় সকল ধর্মের শোষক-শাসকরা একত্রে বিলাস-বৈভবে দিনাতিপাত করে। জগতে রয়েছে দুটি জাত—শোষক ও শোষিত। নিজ ধর্মের লোক বলে মুসলমান জোতদার মুসলমান চাষি প্রজাকেও অত্যাচার করতে ছাড় দেয় না। হিন্দু জোতদার লুঠতে ছাড়ে না হিন্দু কিষাণ বউয়ের ইজ্জত। এই সহজ কথাগুলি শুনলে আজকের দিনে অনেক তথাকথিত পণ্ডিত প্রবরগণ মার্কসবাদের এই দুঃসময়ে এখন হয়তো বক্র হাসি হাসবেন—কিন্তু এটাই যে সত্য, এটাই যে বাস্তব তা বুঝতে বাংলার চাষিদের যেমন সেদিন অসুবিধা হয়নি, তেমনি দেরি হয়নি বাংলা সাহিত্যের অগ্রণী লেখকদেরও। ননী ভৌমিকের 'সলিমের মা' গল্পে তাই আমরা দেখি রক্ষণশীল মুসলমান চাষি মঈনের বৌ আর বৃদ্ধা মা অন্য এক মুসলমান জোতদার করম আলির লাঠিয়ার বাহিনীর দ্বারা বেইজ্জত হয়।

আবু ইস্হাকের 'জোঁক' ছোটগল্পে দেখতে পাই—কীভাবে মুসলমান পাটচাষি ওসমানকে জোঁকের মতো রক্ত চুষে খাচ্ছে আর এক মুসলমান জোতদার ইউসুফ, তার বাপ ওয়াজেদ আলিও ওই একই কারবার করত। সমবেশ বসুর 'প্রতিরোধ' গল্পে দেখা যায় হিন্দু জোতদার পীতাম্বর সা হিন্দুধর্মের গঙ্গাযাত্রা ঘটিয়ে কীভাবে পশুর মতো ধান কাটা খোঁচা খোঁচা মাঠে হিন্দু কৃষক মানুর উলঙ্গ বউকে তাড়া করে নিয়ে গিয়ে জানোয়ারের মতো ধর্ষণ করছে। এইসবই ধর্মের নামে ভণ্ডামীকে মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে। সমসাময়িক সময়ের জীবন্ত দলিল এইসব তীক্ষ্ণ সচেতন গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের নতুন দ্বার নিঃসন্দেহে উন্মোচিত করেছিল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাগদি পাড়া দিয়ে' গল্পে এই নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'বামুনের চেয়ে সেরা জাত এয়েছে পিথিমিতে। মজুরের জাত, খাটিয়ের জাত। যে খাটবে—সে জাতের লোক, বাস। আর সব বেজাত-বজ্জাত।' গ্রামের জমিদারের বজ্জাতির বিহিত করতে তারা নিজেরাই এগিয়ে আসে। জমিদারের প্রতিষ্ঠা করা 'শিবাই ঠাকুরের দেবী' এমন একটা বদ্ধজলার সৃষ্টি করেছে যার ফলে

বর্ষাকালে জলার বাড়তি জলে ডুবে যায় চাষিদের ঘরদোর, অতএব জলটা কাটানো দরকার, তাতে কোদাল পড়বে 'ঠাকুরের থানে'। জমিদার চাষিদের এ নালিশ কানেই তুললেন না, ফলে বিদ্রোহী হল শতাধিক বাগদি মেয়ে-কুড়ুল কোদাল, খন্তা নিয়ে। এতে বাধা দিতে গিয়ে বুড়ো দুলে বাগদি নাস্তানাবুদ হয়। সে জমিদারকে পুলিশকে খবর দেওয়ার হুমকি দেয়। শেষে ঠাকুরের থানে নালা কাটা হলে, বাড়তি বদ জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে রক্ষণশীলতার প্রতীক দুলেকেও সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। ধর্মীয় কুসংস্কার নয়, শ্রমজীবী মানুষেরই বিজয় ঘোষিত হয়।

অসিত ঘোষের 'সামনে লড়াই' (পরিচয়, কৃষক সংগ্রাম সংখ্যা; আষাঢ় ১৩৭৭) গল্পটিও রচিত হয়েছিল গ্রামবাংলার তেভাগা-কৃষক সংগ্রামের অনুষঙ্গে। দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচা এলাকায় কর্মসূত্রে অসিত ঘোষ প্রগতিশীল সাহিত্যদৃষ্টিভঙ্গিতে অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও শোষিত মুসলমান কৃষক পরিবারের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণের ও শ্রেণী চেতনা সঞ্চারের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত প্রতিফলিত এই গল্পে। গল্পকার দেখিয়েছেন শ্রমজীবী মানুষের শেষ আশ্রয়—ভরসা বা হাতিয়ার 'ধর্ম' নয়—প্রখর শ্রেণী-চেতনা। জোতদার ইজাহার কাজী, জান মহম্মদদের কাছে রহিমা, আয়েসার মতন খেতমজুর চাষা-চাষিরা মানুষ নয়, ক্রীতদাস; মুসলমান নয়, কাফের। আল্লাহ্র সকল দোয়া যেন প্রজাপীড়ক জোতদার-জমিদারদের জন্যই অর্পিত—ধর্মে মুসলমান হয়েও শোষিত, দীন-দরিদ্র কৃষকের তাতে হক কোথায়? জোতদারের পাওনা মেটাতে অক্ষম ইয়াসিন চাচার চাষের একমাত্র সহায় প্রাণপ্রিয় বলদটাই হয়ে উঠল ইজাহার কাজীর রোষের বস্তু। তার হুকুমে 'তীক্ষ্ণ ছুরির আড়াই টান। আল্লার নাম করে এক কৃষকের সর্বনাশ করল উন্মত্ত যুবক।' তারপর পাতিলে সিদ্ধ হতে থাকল ইয়াসিন চাচার বলদ। ইয়াসিনের হাহাকার মিশে গেল বাতাসে। ধর্মের নামে ক্ষমতাবানদের এই জুলুমে ছাড় পায় না নারীও—ক্ষুধার্ত আয়েসার প্রায় নগ্ন শরীরের চরম উপলব্ধি তাই। কোনো ধর্মাচারেই হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা এই অত্যাচার-অবিচারের নিদান নেই বুঝেছে আয়েসা, বুঝেছে রহিম আর ইলিয়াস চাচা। মুসলমানীর বোরখা তাই ঘুচে যায়—হিন্দু-মুসলমান শোষিত কৃষকের বাঁচার মন্ত্র তখন একটাই—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। সময়ের জ্বলন্ত দলিল এই গল্পটি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সর্বশ্রেষ্ঠ এপিকধর্মী উপন্যাস 'খোয়াবনামা'তে তেভাগার প্রসঙ্গ যেমন প্রত্যক্ষ ও জ্বলন্ত ভাবে উঠে এসেছে সময়ের হাত ধরে, **'দখল'** গল্পে এই আন্দোলন প্রসঙ্গের অবতারণা তেমন প্রত্যক্ষ নয়—কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক সংগ্রামের অনুষঙ্গেই রচিত এই গল্পটি। ঘটমান বর্তমান ও সুদূর অতীতের তাৎপর্যবাহী মেলবন্ধন লেখক এই গল্পে ঘটিয়েছেন। 'দখল'-এর পটভূমি সদ্য-স্বাধীন ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশে আওয়ামী শাসনকাল। ১৯৫০ সালে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে কমিউনিস্ট বন্দীদের উপর গুলি চালনায় বহু হতাহত হয় (যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দিনাজপুরের তেভাগা সংগ্রামের কৃষক নেতা কম্পরাম সিং)—এর মধ্যে একজন

হলেন কাহিনীর নায়ক ইকবালের পিতা মোবারক হোসেন। স্বামী নিহত হওয়ার পরে ইকবালের মা আর তাঁর জোতদার শ্বশুরের ঘর করেননি। ছেলেকে নিয়ে ঢাকায় নিজের দাদা, প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট নেতার (যার সঙ্গে মস্কোর নিত্য যোগাযোগ) বাড়িতেই আশ্রয় নেয়। ইকবাল মামার কাছেই মানুষ। সেই ইকবাল যুবক বয়সে, বাবার মৃত্যুর ২৩ বছর পরে ফিরে আসে বাপ্-ঠাকুরদার ভিটা উত্তরবঙ্গের সেই গ্রামে—যেখানে একদা শঠ-খল-অত্যাচারী, কয়েক হাজার বিঘা জমির মালিক, বৃহৎ জোতদার মোয়াজ্জেম হোসেনের বড় ছেলে, কলকাতা থেকে বামপন্থী হয়ে আসা মোবারক, অর্থাৎ ইকবালের শহীদ বাবা কৃষকদের সংগঠিত করত, অধিকার অর্জনের সংগ্রামে নেতৃত্ব যোগাত। কিন্তু অবাক বিস্ময়ে এখন দুটি বিষয় ইকবাল দেখে এক. বর্তমান সশস্ত্র জঙ্গি কৃষকরা (যারা জমি দখলের লড়াই লড়ছে) শহীদ মোবারককে ভোলেনি; কিন্তু তারা খতম করে দিতে চায় গণ-নিপীড়নকারী রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়ক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মোবারকের অত্যাচারী জোতদার বাপ মোয়াজ্জেম হোসেন ও তার ছোট ছেলের (ইকবালের চাচা, যে উত্তরাধিকার সূত্রে জোতদারির মালিকানা পাবে) যাবতীয় কৃষক-বিরোধী ষড়যন্ত্র, এমনকি পুরো পরিবার; দুই. জোতদার মোয়াজ্জেমও ভোলেননি পুলিশের গুলিতে রাজশাহী জেলে তাঁর কাফের ও কমিউনিস্ট বড় ছেলের স্মৃতি। শুধু তাই নয়, পরম মমতায় সেই স্মৃতি তিনি জাগিয়ে রেখেছেন গত ২৩ বছর ধরে—শহীদ ছেলের পাশে নিজের কবর তিনি অগ্রিম চিহ্নিত করে রেখেছেন—এন্তেকালের পর প্রিয় আত্মজের পাশে মাটি পাবেন বলে। একি অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা? না, অপত্য স্নেহের নীরব প্রকাশ?

এই চারিত্রিক বৈপরীত্য, দ্বন্দ্ব, মানব হৃদয়ের এক বিস্ময়কর প্রকাশ না শৈল্পিক দলিল।

বাংলা সাহিত্যে তেভাগা-কেন্দ্রিক বিখ্যাত গল্পগুলি ছাড়াও রয়েছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিকদের দ্বারা রচিত বেশ কয়েকটি তেভাগা-আন্দোলন কেন্দ্রিক সংবাদ-প্রতিবেদন যেগুলি গুণগত ব্যঞ্জনায় রস-সাহিত্যের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। কবি ও সাংবাদিক গোলাম কুদ্দুসের একটি রচনা একাধারে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গল্প ও রিপোর্টাজ। এটি **'লাখে না মিলয়ে এক'** যা রসোত্তীর্ণ ছোটগল্পের খ্যাতি অর্জন করেছে। 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত রচনাটির নানাস্থানে অসংখ্য পুনর্মুদ্রণ হয়েছে, এর অসাধারণত্বের জন্য। আসলে এটিকে দিনাজপুরের রক্তে রাঙা মাটি থেকে উঠে আসা কৃষক সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিলও বলা চলে। কুদ্দুস সাহেব শুরু করেছেন এইভাবে *'লাখে না মিলয়ে এক। আমি যাট লাখে পেয়েছিলাম তোমাকে ভিখু, কত বছর আগে কৃষকদের মধ্যে এসেছিল সেই আলোড়ন যাকে বলা হয় তেভাগা আন্দোলন? ...বাংলাদেশের এক অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আন্দোলন যে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এর খবরাখবর জোগাড়ের জন্য আমাকে তখন বহু জায়গায় ঘুরতে হয়েছিল। আজ এতকাল পরে অবাক হয়ে ভাবছি, এত লোকের মধ্যে শুধু তোমার কথাই কেন এমন করে মনে আসছে।'*

এই কৃষক-বালক ভিখুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে টানটান তেভাগার রক্তাক্ত কাহিনী। দিনাজপুরের খাঁপুরে তখন গুলি চলছে, চলছে

পুলিশ-মিলিটারির যৌথ সন্ত্রাস। গোটা গ্রামাঞ্চল পুরুষ শূন্য। বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ। এই অবস্থায় সাংবাদিক গোলাম কুদ্দুস রওনা হয়েছেন খাঁপুর। উদ্দেশ্য সংবাদ সংগ্রহ। কেউ সেই মৃত্যুপুরীতে যেতে সাহস না করায় তিনি একাই এসেছেন। কিন্তু পথে মিলে গেল বীর কৃষক বালক ভিখু। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের অভিমন্যু যে চক্রব্যূহ ভেদ করে পথ দেখাচ্ছে বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ এক সেনানীকে। তাই গোলাম কুদ্দুস লিখেছেন, *'আমি এখন বুঝতে পারছি, কেন সব ছাড়িয়ে তোমার স্মৃতি আমার কাছে এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে। ...তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার মাসখানেক আগে আমি সেইরকম একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। রূপনারায়ণ রায়ের নামটা হয়ত শুনে থাকবে। তোমাদের এলাকার এম. এল. এ। আমি তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে কেরোসিনের ডিবের আলোয় খবর লিখতাম, আর মাঝে মাঝে কান পেতে শুনতাম গ্রামের রাস্তায় পাহারারত ভলান্টিয়ারদের মাতোয়ারা কণ্ঠের আওয়াজ—'জান দেব তবু ধান দেব না।' ...মাটির সানকিতে ডাল-ভাত খেয়ে আমি ওভারকোট গায়ে জড়িয়ে গরম খড়ের বিছানায় শুয়ে শীতে কাঁপতাম, আর পাহারারত ভলান্টিয়ারদের নৈশ বিচরণের জামা-কাপড়ের অবস্থার কথা ভেবে লজ্জা পেতাম। সকালে তারা অনেকে এসে সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে বলত, কমরেট, এটা গায়ে দিলে শীত লাগে না,—না?*

'মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়া কি সোজা কথা?'

তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট সাংবাদিক গোলাম কুদ্দুসের কোনো অসুবিধাই হয়নি তেভাগার দাবিতে সংগ্রামরত কৃষকজীবনের শরিক হতে। এমনকি সাংবাদিকতা করতে গিয়ে কখনো কখনো অবস্থা গতিকে তাঁকে রণক্ষেত্রে কৃষকনেতার দায়িত্ব পর্যন্ত অবিচলিতভাবে পালন করতে হয়েছিল। তার বিবরণও রয়েছে 'লাখে না মিলয়ে এক'-এর মূল্যবান বিবরণ মালায়।

একই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'তেভাগা আন্দোলন' যাঁর নামের সঙ্গে আজ একাত্ম হয়ে গেছে সেই শ্রদ্ধেয় শিল্পী সোমনাথ হোরের বহু পরিচিত **'তেভাগার ডায়েরি'**র রচনাটি। এই আন্দোলনের অন্যতম শৈল্পিক দলিল যদি কিছু থেকে থাকে—তা এই অনবদ্য সচিত্র দিনপঞ্জীটি। এই দুর্লভ সৃজনটি প্রথম প্রকাশের প্রধান কৃতিত্ব যাঁদের, অধুনালুপ্ত 'এক্ষণ' (শারদ, ১৩৮৮) পত্রিকার সেই সম্পাদকদ্বয় প্রয়াত নির্মাল্য আচার্য্য ও শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমরা চির-কৃতজ্ঞ। ডায়েরিটি ইতিমধ্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আন্দোলনের সচিত্র-বিবরণ প্রচারের পশ্চাতে এই প্রকাশনাটির ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পী সোমনাথ হোরের দুর্লভ স্কেচগুলি আজও কৃষক সমাজের সংগ্রামী জীবনের পরিচায়ক রূপে আজও সমান আকর্ষণীয়।

এমন আরো একটি অসাধারণ রিপোর্টাজ স্বাধীনতোত্তর পশ্চিমবঙ্গের জেলা সফর করে লিখেছিলেন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী চলচ্চিত্রকার রূপে নানা প্রতিভার অধিকারী পূর্ণেন্দু (শেখর) পত্রী। ১৯৫০ সাল থেকে অনিলকুমার সিংহ-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক সাহিত্যপত্র 'নতুন সাহিত্য'। তেভাগা কৃষক সংগ্রামের প্রভাবে রচিত নানা ধরনের সাহিত্যকীর্তির প্রকাশস্থল ছিল এই সাহিত্য-পত্রিকা। প্রকাশিত হত

কবিতা, গল্প এবং রিপোর্টাজ। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৬০) থেকে প্রকাশিত হয় পূর্ণেন্দুশেখর পত্রীর রিপোর্টাজ **'অন্য গ্রাম-অন্য প্রাণ'**। ধারাবাহিকভাবে তা টানা চলেছিল 'নতুন সাহিত্য'-র আটটি সংখ্যা ধরে, মাঘ, ১৩৬০ সন পর্যন্ত। এই রিপোর্টাজে সেদিনের তরুণ কবি, আজকের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী দ্বিতীয় পর্যায়ের তেভাগা আন্দোলনের বিবরণ তুলে ধরেছেন। শুধু হুগলি জেলা নয়, পূর্ণেন্দু পত্রীর সফর চলেছিল হাওড়া জেলা, চব্বিশ-পরগণা জেলাতেও। দক্ষিণবঙ্গের এই তিনটি জেলাতেই স্বাধীনতা উত্তরকালে তেভাগা আন্দোলন বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছিল—স্বাধীন দেশের স্বাধীন কংগ্রেসী সরকার-এর গুলিগোলাও স্তব্ধ করতে পারে নি তাকে। দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল, পাল্টাচ্ছিল কৃষকদের চরিত্র ও চেতনার স্তরও। এরই বিবরণ রয়ে গেছে পূর্ণেন্দু পত্রীর অসামান্য রিপোর্টাজ 'অন্যগ্রাম-অন্যপ্রাণ'-এর পাতায় পাতায়। 'নতুন সাহিত্যে'-এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত (১৩৬০) সপ্তম কিস্তির রচনাটিকে আমরা বেছে নিয়েছি এই কারণে যে এর মধ্যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের ছায়া আছে। অনবদ্য গদ্যে রচিত এই রচনাটি বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ। সম্প্রতি এটি বই হিসেবেও প্রকাশিত হয়েছে।

তেভাগা আন্দোলনের তিনজন বিশিষ্ট সেনানীর আরো চারটি অমূল্য স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়। রংপুরের ডোমার থানা এলাকায় প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্যতম নেতা। তাঁর সহযোদ্ধা 'শহিদ পাঁচু তুরী'কে নিয়ে লেখা স্মৃতিচারণটি আন্দোলনের এক অনবদ্য উপাখ্যান। এছাড়া 'পরিচয়' পত্রিকার কৃষক-সংগ্রাম (আষাঢ় ১৩৭৭) প্রকাশিত হয়েছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট লেখক সত্যেন সেনের লেখা 'গ্রাম বাংলার পথে পথে' গ্রন্থ থেকে সংকলিত 'শহীদ কম্পরাম সিং।' দিনাজপুরের এই তেভাগা সেনানী ১৯৫০ সালে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পুলিশের গুলিচালনায় নিহত হন। এটিরও সংযোজন ছিল একান্ত প্রয়োজন। শহীদ কম্পরাম সিং-এর জীবনালেখ্য আজও মানুষের সংগ্রামী চেতনায় শিহরণ জাগায়—কিন্তু তা জানে ক'জন।

একদা পশ্চিমবঙ্গের শাসকশ্রেণি-জোতদার-মহাজনদের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেওয়া নাম ছিল সুন্দরবন অঞ্চলের তেভাগা নেতা অশোক বসু ওরফে বিদ্যুৎ ওরফে নিকুঞ্জ। মৃত্যুদণ্ড এড়িয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি চলে যান মধ্যপ্রদেশের রাজনন্দন গাঁও-এ, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক প্রকাশ রায় নামে পুনরাবির্ভাব ঘটে তাঁর। কিংবদন্তীতুল্য এই কমিউনিস্ট নেতার সহযোগী ১৯৪৯-৫১ সালে সেদিন ছিল সদ্য ডাক্তারি পাশ তরুণ ডা. পূর্ণেন্দু ঘোষ। 'বর্তিকা' পত্রিকার সম্পাদক মৈত্রেয় ঘটক তাঁকে আবিষ্কার করেন বহুযুগ পরে বিলাসপুরের জনপ্রিয় ডাক্তার ঘোষ রূপে—যাঁকে ১৯৭১-৭২-এ পাঁচমাস ও ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থার যুগে উনিশ মাস কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছিল। শ্রী ঘটকের উৎসাহেই ডা. ঘোষ লেখেন 'তেভাগার স্মৃতি' (সেতু সাহিত্য পরিষদ, বিলাসপুর প্রকাশিত, ১৯৮৭)।

এরকমই আর একটি অসাধারণ দলিল হল হুগলি জেলার প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা গোপাল দাসের স্মৃতিচারণ 'ডুবিরভেড়ির পঞ্চকন্যা'। তেভাগা কৃষক সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে রচিত হয়েছে কত না কথকতা; ডুবিরভেড়িতে ১৯৪৯-এর ১৯

ফেব্রুয়ারি পুলিশের পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারে মৃত্যুবরণ করা নিরস্ত্র পাঁচজন বিভিন্ন বয়সের কৃষক রমণীর আত্মত্যাগের প্রত্যক্ষ এই বিবরণ সম্ভবত ছাপিয়ে যায় সমস্ত উপকথাকে। বাস্তব ঘটনার রক্তাক্ত রাজনৈতিক দলিল এই স্মৃতিচারণ—যা আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের নতুন মাত্রা রূপে সংযোজন-যোগ্য। এগুলি গ্রাম বাংলার অবহেলিত ও নির্যাতিত কৃষক সমাজের জীবন সংগ্রামের সত্যকাহিনী যা আলোচনার বাইরে রাখা অপরাধ বলে মনে করেছি। সাহিত্য যে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তু নয়—তারই প্রমাণ সংকলনভুক্ত প্রতিবেদন ও স্মৃতিচারণগুলি।

শেষ প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বলি এই সংকলনে শ্রদ্ধেয় কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বরম লাগের মাঠ' (চতুরঙ্গ, ১৩৬০) গল্পটি ঠিক তেভাগা-বিষয়ক গল্প নয়। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনকে এতে বিপ্রতীপ এক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পটি আগ্রহী পাঠক অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত 'তারাশংকর গল্পগুচ্ছ'-তে (তৃতীয় খণ্ড) পড়ে নেবেন আশা করি। এছাড়া পরবর্তী কালে শিশু-কিশোরদের কাছে তাদের মতন করে তেভাগাকে তুলে ধরার কৃতিত্ব সরোজমোহন মিত্র এবং শুভময় মণ্ডলের। সরোজমোহন মিত্রের কিশোর পাঠ্য 'বুদাখালির লড়াই' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'আলোর ফুলকি'তে।

বেশ কয়েক বছর পূর্বে যখন এই নিবন্ধ লেখক তেভাগার গল্প নামক সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তাতে খুঁজে পেতে এমন অনেকের রচনা প্রকাশ করেন যারা সেই অর্থে সাহিত্যিক রূপে বিখ্যাত নন, কিংবা আদৌ সাহিত্যিক নন, কেউ কেউ রাজনৈতিক কর্মী বা সংগঠক। ১৯৯৬ সালের শারদীয় কালান্তরে প্রকাশিত সুপ্রভাত সিদ্ধান্ত-র 'তেভাগার ডাক' রিপোর্টাজটির মধ্যে একই ধরনের সৃজনশীলতা নিহিত। এই আলোচনাতেও প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বা গল্পকারদের অনেকগুলি ছোটগল্পই রয়েছে; কিন্তু সেইসঙ্গে তথাকথিত 'সাহিত্যিক' উপাধিধারী নন এমন কয়েকজন লেখকের অভিজ্ঞতা-প্রসূত রচনা-প্রতিবেদন-স্মৃতিকথাকেও আমরা সাদরে স্থান করে দিয়েছি। এর কারণ নিহিত আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে। বাংলা সাহিত্যের একজন ক্ষুদ্র সেবকরূপে বর্তমান আলোচকের কাছে যেমন কোনো রচনার সাহিত্যগুণ আদরণীয়, তেমনি ইতিহাসের একজন গবেষক-ছাত্র রূপে মূলে থিম বা বিষয়টিকেও সে উপেক্ষা করতে পারে না। আজ পর্যন্ত বাংলার প্রধানতম গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ কৃষক সংগ্রাম সমকালীন ও পরবর্তী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চৈতন্যকে কীভাবে আলোড়িত করেছিল—তা বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকটি শাখার মাধ্যমে তুলে ধরাই ছিল উদ্দিষ্ট। আশাকরি এই আলোচনা সেই চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে অনেকটাই। তবে আক্ষেপ একটাই—কোনো মহিলা লেখকের লেখা একটিও গল্প বা তেভাগা সংক্রান্ত কোনো সাহিত্য প্রতিবেদনের সন্ধান না মেলায় আলোচনা-ভুক্ত করা গেল না। জানিনা দৃষ্টির অগোচরে এমন রচনা কারো আছে কিনা! সুলেখা সান্যাল, ছবি বসু বা সাবিত্রী রায় (এঁর 'পাকা ধানের গান' উপন্যাসে অবশ্য তেভাগার অনুষঙ্গ উপস্থিত) তেভাগা আন্দোলন নিয়ে কেন একটিও ছোটগল্প লিখলেন না—এটা আমাদের কাছে খুবই বিস্ময়ের। রাণী মুখার্জি বা কল্যাণী দাশগুপ্তরা

যা লিখেছেন তা মূলত অভিজ্ঞতা নির্ভর প্রবন্ধ—'তেভাগার গল্প' তা হয়ে ওঠেনি—যেমনটি নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা গোপাল দাসের স্মৃতিচারণ দুটি অনেকটাই হয়ে উঠেছে।

তেভাগা আন্দোলন ছিল আমাদের দেশের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ও শোষিত সমাজের অন্যায়-অবিচার-বৈষম্য-ক্ষমতার দম্ভ-কর্তৃত্ববাদ ও মানুষের অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সংগ্রাম। তাকে নিয়ে মহৎ উপন্যাস বেশ কয়েকটি রচিত হবে এমন আশা করা বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের পক্ষে অন্যায় নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এক্ষেত্রে ছোট-গল্প যতটা সফল, উপন্যাস ততটা নয়। সাবিত্রি রায়ের ***পাকা ধানের গান*** পঞ্চাশের দশকের প্রথমে প্রকাশিত একটি এপিকধর্মী উপন্যাস যেখানে প্রথম তেভাগা আন্দোলনকে দুই কমিউনিস্ট তরুণ-তরুণীর প্রণয়-আখ্যানের প্রেক্ষাপটে ছুঁয়ে দেখার আন্তরিক প্রচেষ্টা রয়েছে। সৌরি ঘটকের ***কমরেড*** (১৯৬৪) নামক উপন্যাসে। এর আগে বাংলা উপন্যাসে কৃষক সংগ্রামকে তুলে ধরার প্রথম কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে মনোরঞ্জন হাজরা রচিত ***নোঙ্গরহীন নৌকা*** (১৯৪০)। এছাড়া ১৯৩০-এর দশকের কৃষক-আন্দোলনের সূচনার যুগ নিয়ে পূর্ববঙ্গীয় ডায়ালেক্টে রচিত অসাধারণ আর একটি উপন্যাস রমেশচন্দ্র সেনের ***কুরপালা*** (১৯৪৬)। কিন্তু এই দুটিতেই তেভাগা নেই। তেভাগার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে উল্লেখযোগ্য একটি উপন্যাস লেখেন কৃষক-সভার নেতা আবদুল্লাহ রসুলের শহর থেকে গ্রাম (১৯৭০)। জমিদারী ও মহাজনী প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সূচনাকালের বাংলার গ্রামে প্রগতিশীল মুসলমান কৃষক-সংগঠকদের অবদান রসুল সাহেব এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

বস্তুত পূর্ণাঙ্গ একটি তেভাগা আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস আমরা পাই ১৯৮২ সালে প্রকাশিত শিশিরকুমার দাস রচিত ***শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা***-র মাধ্যমে। স্বাধীনোত্তর কালের সুন্দরবন-কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলনকে জীবন্তভাবে লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তেভাগা আন্দোলনকে বিষয় করে ফ্লাশব্যাকের ভঙ্গীতে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার গল্প বলেছেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ***বন্দোবস্তী*** (করুণা প্রকাশন) উপন্যাসে। আধুনিক এক যুবক যার বাবা ছিল কমিউনিস্ট সংগঠক ও তেভাগার এক নেতা সে কিভাবে আজকের চোখে তেভাগার ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে বিচার করে গবেষকের দৃষ্টিতে তাই উপন্যাসটির উপজীব্য।

আগেই উল্লেখ করেছি যে বাংলাদেশের অকালপ্রয়াত তরুণ কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ***খোয়াবনামা***-তে দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে নানাভাবে তেভাগা আন্দোলনের বিষয়বস্তু উপস্থিত। পূর্ববঙ্গে মুসলমান কৃষক-সমাজ কোন্ চোখে তেভাগা-আন্দোলনকে দেখেছিল; তাঁদের উপর মুসমিল লিগের বিভেদমূলক নীতি কি বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল এবং কেরামতের গান শুনে অভিভূত তামিজের মনে এই আন্দোলন, পাকিস্তান দাবি, দেশবিভাগের রাজনীতি কী মিশ্র জটিল মানসিক বৈকল্যের সৃষ্টি করছিল এবং কেনই বা বাঙালী মুসলমানের স্বপ্ন বা খোয়াব অস্তিত্বের সংকটের মধ্যে পড়েছিল তার অসামান্য কথকতা আখতারুজ্জমানের এই উপনাসটিকে বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম সেরা গ্রন্থের সম্মান দেওয়ার উপযোগী।

বাংলা কথাসাহিত্যে তেভাগা আন্দোলনের আরো পরিচয় পাওয়া সম্ভব বাংলাদেশের সাহিত্য ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে। সে প্রয়াস চলছে। সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যেমন নাটক-কবিতা-গানের জগতেও তেভাগার প্রভাব কী ছিল তা নিয়ে গবেষণা-কার্য অব্যাহত। আশা রাখি এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ফলাফল সত্বর পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারব। তথাপি দু-এক কথায় উল্লেখ করা যায় নাটকের বিষয়টি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মিহির সেনের নাট্যরূপ দেওয়া হলুদপোড়া, হারানের নাতজামাই বা ছোটবকুলপুরের যাত্রী ছাড়া ১৯৫০-এর দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বেশ কয়েকটি নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছিল। যেমন নয়ানপুর, উদয়াস্ত, এই মাটিতে, ঢেউ, তরঙ্গ, ডাক প্রভৃতি। এর মধ্যে কাকদ্বীপের চন্দনপীড়িতে ১৯৪৮ সালের ৬ নভেম্বর কৃষক মিছিলের উপর কংগ্রেসী সরকারের গুলিচালনায় শহীদ হওয়া অহল্যা, বাতাসী, সরোজিনী, উত্তমা, অশ্বিনী, গজেন ও দেবেনদের বীরত্ব নিয়ে রচিত নয়ানপুর ছিল উল্লেখযোগ্য। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে আজকে কলকাতার রাজপথে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের উত্তরাধিকার বহনকারী ও তার সঙ্গে জোটবদ্ধ তৃণমূল নামক দলটির নেত্রী কত নির্লজ্জ হলে তেভাগা আন্দোলনের শহীদদের কথা উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেন না। বুর্জোয়া রাজনৈতিক ভণ্ডামি সেদিনও ছিল; কিন্তু আজ যেন তা সকল সীমা অতিক্রম করে গেছে।

যাহোক বিখ্যাত লেখক নন এমন আরো অনেকের রসোত্তীর্ণ রচনা সময় ও স্থানাভাবে আলোচনা করা গেল না। বিশেষত উপন্যাস ও নাটক নিয়ে পৃথক আরেকটি নিবন্ধ লেখার ইচ্ছা রইল। এই মুহূর্তে হাতে আছে সুদূর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডী থেকে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত খুশী সরকার রচিত একটি তেভাগা আন্দোলন বিষয়ক নাটক তেভাগা (২০০৩)। অসাধারণ গ্রামীণ যাত্রাপালার পরিবেশন শৈলী তার। এরকম আছে হয়তো আরো অনেক আলোচকের নজরের বাইরে। পরে এগুলিতে আলোকপাতের অভীপ্সা রইল। তবে তেভাগা আন্দোলন নিয়ে রচিত বাংলা সাহিত্য ও শিল্প নিরক্ষর ও স্বল্প লেখাপড়া জানা কৃষক সমাজকে কতটা সংগঠিত করতে বা তাদের সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছিল সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে কথাটি সত্য তা হল তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে কলকাতা সহ শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত পেটি-বুর্জোয়া নাগরিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মিশ্র। বিশেষতঃ সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা ভূমিস্বত্বভোগী নাগরিকদের দৃষ্টিভঙ্গী যে সম্পূর্ণতই বিরূপ ছিল তা বলাই বাহুল্য। কালক্রমে অবশ্য দেখা যায় শিক্ষিত শহরবাসী, বিশেষ করে তরুণ ছাত্র ও যুবকবৃন্দের মধ্যে অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে এবং বিরূপতাও অনেক কেটে গিয়েছে। এঁদের অনেকে গ্রামে গিয়ে কৃষক-আন্দোলন সংগঠনেও সক্রিয় থেকেছেন। সন্দেহ নেই সীমিত পরিসরে হলেও এই ইতিবাচক পরিবর্তনে তেভাগার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সৃজনের বিশিষ্ট অবদান ছিল যা অস্বীকারের উপায় নেই।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

ভবানী সেন রচিত পুস্তকাদি—

১। কৃষক আন্দোলনের নূতন ধারা; (পার্টি প্রচার পুস্তিকা); ১৯৪৩।
২। কৃষক সমিতি কী চায়, ১৯৪৪।
৩। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট ও কৃষকের দাবী, পরিচয়; শ্রাবণ, ১৩৪৭।
৪। ভাঙ্গনের মুখে বাংলা, মে, ১৯৪৫।
৫। মুক্তির পথে বাংলা, ডিসেম্বর, ১৯৪৫।
৬। সংগ্রামের পথে বাংলা, জানুয়ারী, ১৯৪৬।
৭। তেভাগা ম্যুভ্‌মেন্ট ইন বেঙ্গল, দি কম্যুনিস্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ (ইংরাজি)।
৮। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাংলা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭।
৯। বাংলার কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ, অক্টোবর, ১৯৪৮।

বিভূতি গুহ—

১। জমিদারী প্রথার বিলোপ চাই, ১৯৪৩।
২। ফসল ও জমির লড়াই ঃ তেভাগা সংগ্রাম, ১৯৪৭।

কৃষ্ণবিনোদ রায়—

১। জমির লড়াই।
২। চাষীর লড়াই।
৩। তেভাগার লড়াই।
৪। কৃষকের লড়াইয়ের কায়দা ১৯৪৭।
৫। মন্বন্তরের পরিণতি ও পুনর্গঠনের পথ (প্রাঃ কৃষক-সভা)।

অশোক বসু (নিকুঞ্জ ওরফে প্রকাশ রায়), বাঙলার শিশু তেলেঙ্গানা, লালগঞ্জ, ১৯৪৯। (সি পি আই ২৪ পরগণা জেলা কমিটি) তেভাগা লড়াইয়ের শিক্ষা; সি. পি. আই, পঃবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৫০, দক্ষিণ বাঙলার মাটিতে নতুন তেলেঙ্গানা, ১৯৫১।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা প্রকাশিত ঃ তেভাগার লড়াই বৃহত্তম লড়াই, আগস্ট, ১৯৪৭। আগামী তেভাগার লড়াই, নভেম্বর, ১৯৪৯।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার ৩০তম রাজ্য-সম্মেলন স্মরণিকা; ২৮-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫, বীরভূম (তেভাগা সুবর্ণজয়ন্তী সম্মেলন)।

Cooper, Adrienne, *Sharecropping and Sharecroppers' Struggle in Bengal : 1930-50,* K.P.B; 1988.
Custers Peter, *Women in the Tebhaga Uprising : 1946-47,* Calcutta, 1987.
Dasgupta, Atis., *Groundswell in Bengal in the 1940's* NBA, 1995.
Dasgupta Satyajit, 'The Tebhaga Movement in Bengal 1946-47', ***Occasional Paper,*** Calcutta ***CSSSC,*** 1986.
Desai, A. R.—(Ed) *Peasant Struggles in India,* O.U.P., Bombay, 1979.
Sen Sunil, *Agrarian Struggle in Bengal : 1946-47,* P.P.H., Delhi, 1972.
—*Peasant Movements in India,* K.P. Bagchi, Calcutta, 1982.
Gupta, Amit Kumar : 'Agrarian protest in Kakdwip of 24 Parganas-an appraisal' In Amit kumar Gupta (ed.) ***Agrarian Structure and peasant revolt in India,*** New Delhi, Criterion Publication. 1986. (ed.) ***Agrarian Structure and peasant revolt in India,*** New Delhi, Criterion Publication. 1986.
চৌধুরী, বিনয়ভূষণ; ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার কৃষি ইতিহাস (১ম), কলকাতা, ২০০১ (অনু : অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।
রসুল, আবদুল্লাহ; কৃষক সভার ইতিহাস, নবজাতক, কলকাতা, ১৯৭৮।
রায়, ধনঞ্জয়; তেভাগা আন্দোলন, আনন্দ, ২০০০।
সেন সুনীল; বাংলার কৃষক সংগ্রাম; কলকাতা, ১৯৭৫।
সেনগুপ্ত, অমলেন্দু; উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব, পার্ল, কলকাতা, ১৯৮৯।
হোর সোমনাথ, তেভাগার ডায়েরি; সুবর্ণরেখা; কলকাতা, ১৯৯১।
তেভাগা আন্দোলনের রজত-জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা : সুমিত চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৯৭৩।
তেভাগার সংগ্রাম—ফিরে দেখা; সম্পাদক—বিনয় কোঙার,
(পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা কর্তৃক প্রকাশিত; সেপ্টেম্বর ১৯৯৬)
তেভাগার লড়াই (সংকলন গ্রন্থ), ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৪, কলকাতা।
সমাজ সমীক্ষা (তেভাগার পঞ্চাশ বছর); ডিসেম্বর ১৯৯৬, কলকাতা, সম্পাদক : সুহাস চট্টোপাধ্যায়।

এছাড়া প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখিত বিভিন্ন লেখকের গল্প-গ্রন্থ ও উপন্যাসাদির নাম পৃথক করে পুনঃমুদ্রিত হল না।

Susnata Das, Vidyasagar Centre for Indological Studies,
Rabindrabharati University, Kolkata
susnatadas@rediffmail.com